রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

নবম সংস্করণ

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

এক টাকা

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। *** এজন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। *** যেমন টিয়া পাখির গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না, ছানাবেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে। তেমনি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না। ছেলেবেলায় তাদের মন অল্পতেই স্থির হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর অমূল্য উপদেশের কয়েকটি একত্রে প্রকাশিত হল। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ পাঠ করে আজকাল অনেকেই শান্তি ও আনন্দ লাভ করছেন। আশা করি, বাংলাদেশের খোকাখুকিরাও রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প পাঠ করে আনন্দ লাভ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী দিবস

১১ ফাল্গুন, ১৩৪২

সূচীপত্র

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে রামকৃষ্ণদেব সেখানে ছিলেন। এমন শিক্ষিত লোক ভারতে নেই, যে তাঁর নাম শোনে নি। পৃথিবীর যত বড় বড় লোক, প্রায় সকলেই আজকাল রামকৃষ্ণের কথা জানেন ও তাঁকে ভক্তি করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি দেখে নি, এমন ছেলে মেয়ে বাংলা দেশে খুব কমই আছে।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি

পঞ্চাশ বৎসরও হয় নি রামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম সারা জগতে ছড়িয়ে

পড়েছে। তিনি যে-ভাবের মানুষ ছিলেন, সেরূপ মানুষের নাম এত শীঘ্র ছড়িয়ে পড়া কম আশ্চর্যের বিষয় নয়।

দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দির। রামকৃষ্ণ করতেন মায়ের পূজো। তাঁর অসাধারণ ভক্তিতে মা স্থির থাকতে পারেন নি, তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। আমরা আমাদের মাকে যেমন সর্বদা দেখি, মার সঙ্গে কথা বলি, মা যেমন বলেন তেমনি চলি, রামকৃষ্ণও তেমনি মা কালীকে সর্বদা দেখতে পেতেন, মার সঙ্গে কথা বলতেন, মা তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন, মার কথা ছাড়া রামকৃষ্ণ এক পা-ও চলতেন না।
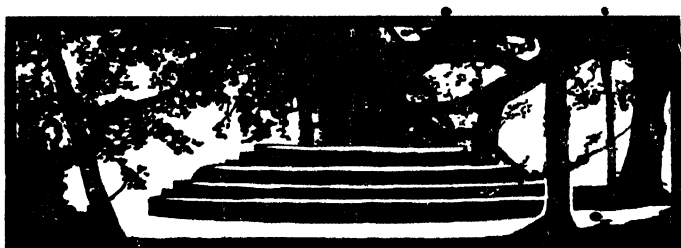
রামকৃষ্ণের সাধনার স্থান পঞ্চবটী

হিন্দুদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে, অনেক মত আছে। যারা মা কালীর পূজো করে তারা শাক্ত। যারা বিষ্ণুকে পূজো করে তারা বৈষ্ণব। শিবের পূজকরা শৈব। ব্রহ্মের উপাসকগণ ব্রাহ্ম। আরো কত মত যে হিন্দুদের মধ্যে আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

রামকৃষ্ণের মনে সাধ হয়েছিল তিনি সব মতে ভগবানের

সাধনা করবেন। মায়ের ইচ্ছায় তাই হল। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি মতে সাধনা আরম্ভ করলেন। মায়ের আদুরে ছেলে তিনি। তাঁর যখন যা আবশ্যক হয়েছে, সবই মা যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর যখন যেমন সাধনার ইচ্ছা হয়েছে, সে রকম গুরু তাঁর কাছে তখন এসেছেন। যে সব জিনিস তাঁর দরকার হয়েছে, তাই তিনি পেয়েছেন।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি বললেন, সব ধর্মই সত্য। সব ধর্মই এক ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁর কাছে যাবার নানা পথ। ধর্মগুলো ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ মাত্র। যত মত তত পথ।

কলিকাতার অনেক বড় বড় বিদ্বান লোক তাঁর নাম শুনে দক্ষিণেশ্বরে যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁকে যে একবার দেখেছে,

রামকৃষ্ণের সাধনার স্থান বেলতলা

তাঁর কথা একবার যে শুনেছে, জীবনে সে তাঁকে ভুলতে পারে নি,

এমন একটা জিনিস রামকৃষ্ণের মধ্যে ছিল। তিনি সোজা সোজা কথায় ছোট ছোট গল্পে এমন সুন্দর উপদেশ দিতেন, লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। পণ্ডিতেরা ভুলে যেতেন তাঁদের বিদ্যার অভিমান, ধনীরা ভুলে যেত ধনের অহংকার, শোকাতুর ভুলে যেত দারুণ পুত্রশোক! ধর্মপিপাসু তাঁর উপদেশ শুনে শান্তিলাভ করত। পাপী তাপী তাঁর কাছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াত।

কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা এই, রামকৃষ্ণ লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। তথাপি ধর্মের যত বড় কঠিন প্রশ্নই হ'ক না কেন, তিনি জলের মত সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। কারু মনে তিনি দুঃখ দিতেন না বা কাউকে নিরাশ করতেন না, যে যেমন তাকে তেমনি উপদেশ দিতেন।

তাঁকে সকলে রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে। পরমহংসের মানে আছে। দুধে জলে একত্র করলে একেবারে মিশে যায়। তারপর জল ও দুধ আর পৃথক করতে পারা যায় না। কিন্তু একরকম হাঁস আছে, দুধে জলে মিশিয়ে খেতে দিলে তারা অনায়াসে শুধু দুধটুকুই খেয়ে ফেলে। যেমন জল তেমনি পড়ে থাকে। এই দুধ-জলের মত এ সংসারও ভাল-মন্দতে মিশানো। ভাল নিতে গেলে তার সাথে মন্দও কিছু-না-কিছু নিতে হয়। কিন্তু এমনও বাহাদুর লোক আছেন, যাঁরা সংসারের ভালমন্দ হতে শুধু ভালটুকুই বেছে নেন, মন্দ ত্যাগ করেন। তাঁদের নামই পরমহংস।

রামকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এই বাংলা দেশেরই একটি ছোট্ট

গ্রামে, হুগলী জেলার কামারপুকুরে। তাঁর মা বাবা দুজনেই বড়

কামারপুকুরে রামকৃষ্ণের জন্মস্থান

ধার্মিক ছিলেন। রামকৃষ্ণের বড় বয়সের কাহিনী যেমন সুন্দর তাঁর ছেলেবেলার কথাও তেমনি চমৎকার।

সাধু সম্বন্ধে সাধারণ লোক মনে করে যারা জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে, মাটি থেকে সন্দেশ বের করে, লোহাকে সোনা করে, মরাকে প্রাণ দেয়, তারাই বুঝি খুব বড় সাধু। এই সব অদ্ভুত অলৌকিক কাজকে বলে সিদ্ধাই। সিদ্ধাইকে রামকৃষ্ণ বড় ঘৃণা করতেন। তাঁর জীবনে সিদ্ধাই তিনি বড় একটা দেখান নি। তবু পণ্ডিতরা বলেন, তাঁর মত এত বড় মহাপুরুষ জগতে আর আসেন নি। তাঁর সম্বন্ধে কত বই যে কত জন লিখেছেন, সে সব বলতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যায়। তাঁর জীবনী ও উপদেশ পৃথিবীর সব বড় বড় ভাষাতেই ছাপা হয়ে গেছে। সে

সব পড়ে সারা পৃথিবীর বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য লোক একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

মহাপুরুষরা চলে যাবার শত শত বৎসর পর তাঁদের জীবনী ও উপদেশ লেখা হয়ে থাকে। তখন ভক্তেরা ভক্তির আধিক্যের জন্য নানা অলৌকিক কাহিনী জুড়ে এবং উপদেশের মধ্যে নানা কথা কমবেশি করে তাঁদের জীবনী ও উপদেশ লিখে থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের সেরূপ হতে পারে নি। তিনি জীবিত থাকতে থাকতেই তাঁর সম্বন্ধে নানা বই বের হয়েছিল। তারপর তাঁর অধিকাংশ পুস্তকই তাঁর নিজের হাতে গড়া শিষ্যদের লেখা। তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর কথা শুনেছেন, এমন বহুলোক এখনও বেঁচে আছেন।

রামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন সারদামণি দেবীকে। যেমন রামকৃষ্ণ তেমনি সারদামণি। নিজে সুখে থাকব, আনন্দ করব, এরূপভাব তাঁদের কারু মনে ছিল না। তাঁরা ভগবান, মানুষের মঙ্গল বই আর কিছু জানতেন না। পৃথিবীর সকল মেয়ের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মা কালীকে দেখতেন। এমন কি নিজের স্ত্রী সারদামণিকেও তিনি মা কালীর মতই দেখতেন। তাঁকে তিনি কালীজ্ঞানে পূজোও করেছিলেন।

সন্ন্যাসী হয়েও রামকৃষ্ণ সারদামণিকে ত্যাগ করেন নি। তিনি তাঁকে আদর করে কাছে রেখেছিলেন ও যত্নে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর বৃদ্ধা জননীকেও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসেছিলেন এবং যতদিন মা বেঁচেছিলেন, একদিনের জন্যও মায়ের সেবায় এতটুকু ত্রুটি করেন নি।

সারদামণিও ধর্মে অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণের শরীর যাবার পর দলে দলে লোক সারদামণি দেবীর চরণে আশ্রয় লাভ করবার জন্য ছুটে যেত। তিনি ছিলেন সকলের মা। মা-ও বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর উপদেশ ও রামকৃষ্ণের উপদেশ একই রকম সুন্দর।

রামকৃষ্ণের বহু শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গগুণে অনেকেই সংসার ত্যাগ করে ভগবানলাভের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। রামকৃষ্ণের জীবন জানতে হলে বিবেকানন্দের জীবনও জানতে হয়। বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবন ও অলৌকিক কর্মরাশি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তার মূলে তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস। সুদক্ষ ভাস্কর যেমন একখণ্ড পাথর নিয়ে তাই থেকে মনোহর দেব-প্রতিমা প্রস্তুত করে, রামকৃষ্ণও তেমনি যুবক নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গড়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

একান্ন বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁর শরীর যাবার পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ভারতের নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন এবং একান্তে সাধন-ভজনে মন দিলেন।

এই সময় এমেরিকার শিকাগোতে একটি বিরাট ধর্ম-মহাসভা হয়। এমন সভা পৃথিবীতে আর কখনও হয় নি। তাতে পৃথিবীর সব ধর্মের লোককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুধু নিমন্ত্রণ করা হয় নি হিন্দুধর্মকে। কারণ, ইউরোপ ও এমেরিকার সাদা লোকেরা ভারতের লোককে মানুষের মধ্যে

গণ্য করত না, ভারতের ধর্মকেও তারা অসভ্যদের ধর্ম বলে ভাবত।

মাদ্রাজের কয়েকজন লোক স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে, একপ্রকার জোর করেই তাঁকে এমেরিকার সেই ধর্ম-মহাসভায় পাঠিয়ে দিলে। তাঁর খরচপত্র তারা সব চাঁদা করে সংগ্রহ করলে। নিমন্ত্রিত না হয়েও স্বামিজী গেলেন এমেরিকাতে। সেখানে গিয়ে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার বলে ধীরে ধীরে সব বিষয়েই সুবিধে হয়ে গেল। স্বামিজীর বয়স তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর।

ধর্ম-মহাসভার কাজ আরম্ভ হল। পৃথিবীর সব ধর্মের বাছা বাছা লোক নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে সেখানে বক্তৃতা করেছেন, আর শুনেছেন এমেরিকার শিক্ষিত বিদ্বান পণ্ডিত বহু হাজার নরনারী। স্বামিজীর বক্তৃতা হয় সকলের শেষে। তাঁর বক্তৃতা এত চমৎকার হয়েছিল যে, সমস্ত শ্রোতা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সেখানকার সমস্ত খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতা ছবি ও অজস্র প্রশংসা বের হল। রাস্তায় রাস্তায় তাঁর বড় বড় রঙিন ছবি লাগিয়ে দিলে। ছবির সামনে লোকের ভিড় লেগে গেল।

ধর্মসভায় তিনি অনেকগুলো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর সে দেশের বহুস্থানে তিনি বহু বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার ফলেই ঐ সব দেশে হিন্দুধর্মের আজ এত সম্মান। 'আরও

আশ্চর্যের বিষয়, ঐ দেশের বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক আজকাল এই অসভ্য ভারতবাসীর ধর্মই গ্রহণ করছেন।
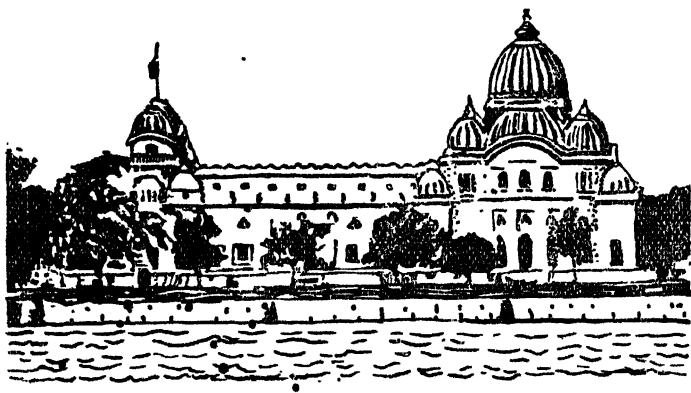
বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-মন্দির

এমেরিকা হতে ফিরে এসে স্বামিজী তাঁর গুরুদেবের নামে করলেন মঠ প্রতিষ্ঠা। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় মঠ। আর করলেন রামকৃষ্ণ মিশন নামে সমিতি স্থাপন। রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে বিবেকানন্দ ধর্মজগতে যেমন অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন, তাঁর হৃদয়ও হয়েছিল তেমনি মহান। তাঁর শিষ্যদের শুধু ধর্ম শিক্ষা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তাদের দিলেন তিনি দেশের আর্ত পীড়িত বিপন্ন আশ্রয়হীনদের সেবার ব্রত। আজ যেখানে বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কথা আমরা যে শুনতে পাই, তা স্বামী বিবেকানন্দেরই কীর্তি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কোন

ধনসম্পত্তি থাকে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অতুল ধনসম্পত্তি অর্জন করে রেখে গেছেন, দেশের সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়েদের জন্য। তাঁদের অমূল্য ভাবরাশি, জীবনপ্রদ অমৃতবাণী, এই অক্ষয় ধন যে ভোগ করতে চাইবে সেই পাবে। অফুরন্ত এ ভাণ্ডার ফুরোবার নয়।

এ যুগের জীবন্ত দেবতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আমরা নমস্কার করি। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁদের আবির্ভাব হ'ক।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প

জটিল

মানুষ ঈশ্বরকে পাবার জন্য কত যাগ যোগ তপস্যা কত কি করে। কিন্তু সরল বিশ্বাসে তাঁকে ডাকতে পারলে তিনি সহজেই দেখা দেন।

এক বিধবার একটি ছোট ছেলে ছিল। তার নাম জটিল। জটিল দূরে গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়তে যেত। বিধবা বড় গরিব ছিলেন। তাঁদের আপন বলতে আর কেউ ছিল না। জটিলকে একটা বনের ভিতর দিয়ে পাঠশালে যেতে হত। জটিল বড় ছোট ছেলে। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রোজই তার বড় ভয় করত। একদিন মার কাছে কেঁদে সে বললে, মা, একা একা পাঠশালে যেতে আমার বড্ড ভয় করে। আমার সঙ্গে একটি লোক দাও। নইলে আর পাঠশালে যাচ্ছি নে।

জটিলের কথায় মার মনে দুঃখ হল; বললেন, লোক কোথা পাব বাছা? বনে তোমার এক দাদা থাকে। তার নাম মধুসূদন। ভয় পেলে তাকে ডেকো। সেই তোমার সঙ্গে যাবে।

মায়ের কথায় জটিলের মনে বড় আনন্দ হল। পাঠশালে

যাবার পথে বনে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সে ডাকতে আরম্ভ করলে, মধুসূদনদাদা, ওগো মধুসূদনদাদা, এস, আমার বড্ড ভয় করছে।

কেউ আসছে না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে জটিল আরও চীৎকার করে ডাকতে লাগল। তার স্থির বিশ্বাস, মধুসূদনদাদা আসবেই।

জটিলের সরল ভক্তিতে ভগবান আর থাকতে পারলেন না। একটি ছোট বালকের রূপ ধরে হাসতে হাসতে তিনি জটিলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এই যে ভাই, আমি এসেছি।

জটিলের তখন কি আনন্দ! রোজ মধুসূদনদাদা পাঠশালে দিয়ে আসে, আবার ফেরবার সময় বাড়ির পথে রেখে যায়। দুজনে কত গল্প, কত খেলা, কত আনন্দ।

এভাবে দিন যায়। তারপর একদিন গুরুমশায়ের মা মারা গেলেন। গুরুমশায় মায়ের শ্রাদ্ধ করবেন। ছাত্রেরা নিজেদের সাধ্যমত যে যা পারে গুরুমশায়কে দিচ্ছে। কেউ দিচ্ছে চাল, কেউ দিচ্ছে দুধ, কেউ দিচ্ছে পাতা, এরূপ সব। গুরুমশায় জটিলকে জিজ্ঞেস করলেন, জটে, তুই কি দিবি রে?

জটিল বললে, আজ্ঞে, মাকে জিজ্ঞেস করে বলব।

পাঠশালা থেকে ফিরে এসে জটিল তার মাকে সব বললে। শুনে মা বললেন, বাবা, গুরুমশায়কে দেবার মত আমাদের যে কিছুই নেই। আমরা যে বড় গরিব। তুমি তোমার মধুসূদন-দাদাকে একথা বলো।

মধুসূদন ও জটিল

জটিল বড় সুবোধ ছেলে। মায়ের দুঃখ সে বুঝত। পরদিন পাঠশালে যাবার সময় জটিল মধুসূদনদাদাকে গুরুমশায়ের কথা জানালে। মধুসূদনদাদা বললেন, তার আর কি? কবে শ্রাদ্ধ?

—কাল।

—আচ্ছা, গুরুমশায়কে বলো, শ্রাদ্ধে যত দই লাগবে, তুমি সব দেবে।

পাঠশালে যাবার পর গুরুমশায় জিজ্ঞেস করলেন, কিরে জটে? কি দিচ্ছিস? তোর মা কি বললে রে?

—আজ্ঞে, শ্রাদ্ধে যত দই লাগবে আমি দেব।

—বটে, জটের মত এমন ভাল ছেলে আর কি আমার আছে! তবে বাবা একটা কথা শোন, দেখিস্ যেন দেরি না হয়। কালই যে শ্রাদ্ধ!

—আজ্ঞে, কাল সকালে দিয়ে যাব।

শ্রাদ্ধবাড়িতে পরদিন সব ছেলেরা মিলে কাজকর্ম করছে। এখনও জটিলের দেখা নেই। গুরুমশায় ভারি চিন্তিত হয়ে গেছেন। যদি দই নিয়ে না আসে,তবে সবই যে পণ্ড। না, একটি ছেলের কথায় বিশ্বাস করে ভাল কাজ করা হয় নি।

জটিল তখন দই নিয়ে আসছে। তাকে আসতে দেখে একটি ছেলে গুরুমশায়কে ডেকে বললে, গুরুমশাই, ঐ যে জটিল এসেছে। আর দেখুন, মস্ত বড় এক ভাঁড় দই এনেছে!

জটিলের হাতে ছোট একটি ভাঁড় দেখে, গুরুমশাই একেবারে

রেগে আগুন। বললেন, শ্রাদ্ধের সব দই না তুই দিবি? আর দই কই?

আজ্ঞে, আমি ছোট কিনা, বেশি আনতে পারব না, মধুসূদন-দাদা তাই এ ছোট ভাঁড়টিই দিয়েছেন। তিনি বললেন, এতেই সকলের হবে।

জটিলের কথা শুনে গুরুমশায় আরও গেলেন রেগে। জোর করে দইএর ভাঁড়টি জটিলের হাত থেকে টেনে নিয়ে একটি ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, যা, এই দই আর একটা পাত্রে ঢেলে রেখে ভাঁড়টা হতভাগাকে ফিরিয়ে দে।

তারপর—আমার মার শ্রাদ্ধ তুই পণ্ড করলি লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আজ তোরই একদিন না আমারই একদিন,—এই বলে জটিলকে মারতে আরম্ভ করলেন। জটিল সামলাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে আর একটি ঘটনা হল! যে ছেলেটি দই রাখতে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বললে, গুরুমশায়, অবাক কাণ্ড! দই যত ঢালছি, ফুরোচ্ছে না।

—অ্যাঁ, বলিস কি রে?

—হ্যাঁ গুরুমশায়, ভাঁড় থেকে যেই দই ঢালছি, অমনি দেখি ভাঁড় আবার আগের মত দইএ ভর্তি হয়ে গেছে।

অ্যাঁ, তবে তো জটিল আমার সত্যিই বলেছিল। আহা, বাছাকে মিছি মিছি মেরে কষ্ট দিলুম। কে কোথা আছিস রে, কিছু জল আন দেখি, আর একখানা পাখা নিয়ে আয়।

সকলে মিলে জটিলের মাথায় চোখে মুখে জল দিতে লাগল। তুজন লেগে গেল হাওয়া করতে। খানিক পরে জটিল চোখ চাইলে। গুরুমশায় তাকে আদর করে কোলে নিলেন, আয় বাপধন আমার, না বুঝতে পেরে তোকে মেরেছি। হাঁরে, তোর কি বড্ড লেগেছে?

—না গুরুমশায়।

—আচ্ছা, এ দই তুই কোথা পেলি রে জটে?

—আমার মধুসূদনদাদা দিয়েছে।

—তোর মধুসূদনদাদা? তিনি কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে, তিনি এই বনেই থাকেন।

—বটে, তুই তোর মধুসূদনদাদাকে আমায় একবার দেখাতে পারবি, বাবা?

—কেন পারব না? আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

গুরুমশায় আর ছাত্রের দল জটিলের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। বনে গিয়ে জটিল উচ্চৈঃস্বরে মধুসূদনদাদাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু আজ মধুসূদনদাদার দেখা নেই। জটিল মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেঁদে কেঁদে আবার ডাকতে আরম্ভ করলে। তখন দূরে থেকে মধুসূদনদাদার কথা শুনতে পাওয়া গেল, জটিল, আজ আমি আসতে পারব না। তুমি সরল বিশ্বাসে আমাকে পেয়েছ। তোমার গুরুমশায় ও অন্যান্য ছাত্রদের তোমার মত বিশ্বাস নেই। তারা আমায় দেখতে পাবে না। তারা চলে গেলেই আমি তোমার কাছে আসব।

সিংহের বাচ্চা

মানুষের অন্তরে ভগবান অনন্ত শক্তি দিয়েছেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে যে উন্নতি করতে চেষ্টা করে, সেই উন্নতি করতে পারে। যার আত্মবিশ্বাস নেই, কখনও তার উন্নতি হয় না। আমরা সকলেই সর্বশক্তিমান ভগবানের সন্তান। একথা আমরা ভুলে যাই আর নিজেকে নিজে ছোট মনে করে উন্নতির পথে যেতে পারি নে।

পাহাড়ের ধারে এক মেষপালক মেষ চরাচ্ছিল। মেষপালক গাছতলায় বসে তামাক খাচ্ছে আর মেষগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। সেখানটার পরেই একটি ছোট পাহাড়ী নদী, তারপর পাহাড়।

সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নাই। মেষপালক বাড়ি ফেরবার জন্য উঠল। এমন সময় নদীর ওপারে একটা ভীষণকায় সিংহী এসে দাঁড়াল। তার চোখে যেন বিজলি খেলছে। মেষগুলো ভয়ে চীৎকার করতে লাগল আর মেষপালক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সিংহীটা এক লাফে একেবারে নদীর এপারে এসে পড়ল। তখন একটা কাণ্ড হল। সিংহীটা ছিল পূর্ণ গর্ভবতী। হঠাৎ জোরে লাফ দেওয়াতে সিংহীর একটি বাচ্চা হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহীটাও সেখানে পড়ে মরে গেল।

সিংহীর অবস্থা দেখে মেষপালক তার বাচ্চাটাকে কোলে করে মেষপাল নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। সেদিন থেকে সিংহের

বাচ্চা মেষপালের সঙ্গে বড় হতে লাগল। সে মেষের দুধ খায় আর মেষশাবকদের সাথে খেলা করে বেড়ায়।

দিন যায়, সিংহের বাচ্চা ঘাস খায়, মেষপালের সঙ্গে মাঠে চরে বেড়ায়। তারপর একদিন পাহাড় থেকে আর একটা সিংহ সেই মেষপালে এসে পড়ল। তখন মেষগুলো ভয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে পালাচ্ছিল। সিংহের বাচ্চাটাও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে তাদের সঙ্গে পালাচ্ছিল। বাচ্চার কাণ্ড দেখে সিংহ তো অবাক! সে আর কাউকে ধরলে না, সেই সিংহের বাচ্চাটাকে ধরে টেনে টেনে বনের ভিতর নিয়ে গেল। বাচ্চাটি তখনও মেষের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকছিল।

বনের মাঝখানে গিয়ে সিংহ বাচ্চাটাকে বললে, দেখ, তুইও আমার মত একটা সিংহ। মেষের সঙ্গে থেকে থেকে তুই নিজেকে মেষ বলে মনে করছিস, তাই একেবারে মেষেরই মত হয়ে গেছিস।

বাচ্চার মনে তখনও সিংহের কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভয়ে সে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না। বাচ্চার মনের ভাব বুঝতে পেরে সিংহ তাকে জলের ধারে নিয়ে গেল আর বললে, দেখ্, জলে আমাদের ছায়া পড়েছে। আমিও যা, তুইও তা। কেন মিছে ভয় করিস? দেখ্, আমার যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি। আজ থেকে মনে রাখিস, মেষ নোস, তুই পশু-রাজ সিংহ। সমস্ত পশুগুলো তোকে ভয় করবে। আর মেষপালে যাস নি, যা বনে যা। তুই বনের রাজা।

সিংহের কথায় বাচ্চা একবার জলের দিকে আবার নিজের ও সিংহের দিকে তাকাচ্ছিল। তখনও ষোলআনা বিশ্বাস হয় নি, একটু একটু ভয় তখনও তার মনে হচ্ছিল।

তারপর খানিকটা মাংস এনে সিংহ খেতে লাগল আর খাবার জন্য বাচ্চাকেও অনুরোধ করতে লাগল। বাচ্চা কিছুতেই মাংস খেতে চায় নি। শেষকালে সিংহ জোর করে খানিকটা মাংস খাইয়ে দিয়ে চলে গেল।

সিংহের বাচ্চা, অন্তরে যে তার সিংহের শক্তি রয়েছে। মেষের সঙ্গে লালিত পালিত হওয়ায় তার মধ্যে সিংহভাব বিকাশ হয় নি। মেষপালে থাকত, সে নিজেকে মেষ বলেই মনে করত। কখনও জানত না যে, সে একটি সিংহ। আজ রক্তের স্বাদ পেয়ে আর সিংহের উপদেশে তার মনে সিংহভাব জেগে উঠল। তখন সে মাথা তুলে দাঁড়াল, মেঘের মত গম্ভীর স্বরে এক ডাক দিলে, তারপর ধীরে ধীরে গভীর বনে চলে গেল। সিংহের ডাকে সারা বন কেঁপে উঠল।

নিজেদের দুর্বল অক্ষম ছোট ভেবেই আমাদের যত দুঃখ আমরা ডেকে এনেছি। অন্তরে আমাদের আত্মাসিংহ ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে জাগাতে হবে। তাঁর অসীম শক্তির কাছে পৃথিবীর সকল শক্তি তুচ্ছ।

এগিয়ে যা

উন্নতি করবার শক্তি ভগবান মানুষের ভিতর দিয়েছেন। উন্নতির পথে মানুষ যত এগিয়ে যায়, আরও উন্নতি করবার শক্তি তার ভিতরে সে পায়। উন্নতির পথে যেতে যেতে কোন কোন মানুষ আটকে যায়। তার আর উন্নতি হয় না। পথে না থেমে যে এগিয়ে চলে সেই বড় হয়।

এক কাঠুরে ছিল বড় গরিব। সারাদিন বনে সে কাঠ কাটত আর সন্ধ্যাবেলা গ্রামে এসে সে কাঠ বিক্রি করত। রোদ নেই জল নেই, অসুখ নেই বিসুখ নেই, রোজই তাকে কাঠ কাটতে যেতে হত, আর মাথায় করে সব কাঠ বয়ে এনে বিক্রি করতে হত। তাতে যে সামান্য পয়সা সে পেত, তাতেই সংসার তার কোন রকম চলত।

খেটে খেটে কাঠুরের ভারি দুরবস্থা হল। গায়ে কখানা হাড় ছাড়া যেন আর কিছু ছিল না। একদিন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গেছে, বনের মধ্যে এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা। কাঠুরের অবস্থা দেখে সাধুর মনে বড় দয়া হল। তিনি তাকে বললেন, আরও এগিয়ে যা।

সাধু চলে গেলেন। কাঠুরে মনে মনে ভাবতে লাগল, সাধু আমাকে আরও এগিয়ে যেতে বললেন। তা একটু গিয়েই দেখি। এই ভেবে কাঠুরে বনের ভিতর এগিয়ে চলল। যেতে যেতে সে গভীর বনে উপস্থিত হল। গিয়ে দেখে সেখানে শুধু চন্দনের বন। খানিকটা চন্দন কাঠ কেটে কাঠুরে

সেদিন বাড়ি ফিরল। সাধারণ কাঠের চেয়ে চন্দন কাঠের বিশগুণ দাম। কাঠুরে সেদিন অনেক পয়সা পেলে।

তারপর রোজই সে চন্দনের বনে চলে যেত, আর চন্দন কাঠ এনে বিক্রি করত। সংসারে তার আর আগের মত কষ্ট নেই। কিছুদিন পর তার মনে হল, সাধু তো আমাকে এগিয়ে যেতেই বলেছিলেন, আরও কিছু এগিয়ে দেখি না, কি হয়। সেদিন সে বনে গিয়ে চন্দন বনের পর আরও এগিয়ে চলল। খানিক গিয়ে সে দেখলে তামার খনি। খানিকটা তামা কাপড়ে বেঁধে সে ঘরে ফিরে এল। চন্দনের চেয়ে তামার দাম বেশি। কাঠুরে অনেক টাকা পেলে। তার মনে তখন কি আনন্দ!

তারপর রোজ সে তামার খনিতে যেতে লাগল, আর যতটুকু বয়ে আনতে পারে নিয়ে আসে। এ ভাবে কিছু দিন যায়। কাঠুরের অবস্থা তখন আরও ভাল হয়েছে। কিছুদিন পর তার আবার মনে হল, সাধু তো আমাকে এগিয়ে যেতেই বলেছিলেন। আরও কিছু এগিয়ে দেখি কি পাই। সেদিন সে তামার খনি পেরিয়ে আরও এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেলে এক রূপোর খনি। মহানন্দে কাঠুরে যতটুকু পারলে রূপো নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

দেখতে দেখতে কাঠুরে বড়লোক হয়ে উঠল। পাড়াপড়শিরা বলাবলি করত, কাঠুরে দেবতার ধন পেয়েছে। রূপোর খনি পাবার পর কাঠুরের মনে হল, সাধুর দয়ায় আমার অনেক হয়েছে। আর এগিয়ে গিয়ে কাজ নেই। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। কিন্তু

আবার তার মনে হল, সাধু তো আমাকে এগিয়ে যেতেই বলেছেন। না, আমি থামব না, আরও এগিয়ে যাব।

এই ভাবে কাঠুরে রোজ রোজ খানিকটা এগিয়ে যেতে লাগল। তাতে পর পর সোনার খনি, হীরের খনি, তারপর মণি মুক্তো জহরত সে পেলে। আর কাঠুরেকে কে পায়! তার অবস্থা দেখে রাজারও হিংসে হতে লাগল।

হনুমান সিং

কুস্তিতে হনুমান সিংএর তত নামডাক না থাকলেও পালোয়ান হিসাবে সে নেহাৎ কম ছিল না। আর একটা গুণ তার ছিল, যত বড় কুস্তিগিরই আসুক না কেন, তার সঙ্গে লড়তে হনুমান সিং আপত্তি করত না বা ভয় পেত না।

একবার খুব নাম-করা একজন পাঞ্জাবী মুসলমান কুস্তিগিরের সঙ্গে হনুমান সিং-এর লড়াই হয়। পাঞ্জাবী কুস্তিগির দেখতে যেমন পালোয়ান, কুস্তিতেও তেমনি ওস্তাদ। তার সঙ্গে কুস্তি লড়া বড় যে-সে কথা নয়।

কুস্তির দিন ঠিক হ'ল। কুস্তির পনের দিন আগে থেকে পাঞ্জাবী পালোয়ান খুব করে ঘি মাংস বাদাম পেস্তা এই সব খেলে। এদিকে হনুমান সিং কদিন ধরে কম কম খেয়ে ভক্তি-ভাবে মহাবীরের নাম জপ করতে লাগল। হনুমান সিং-এর গায়ে ময়লা কাপড় আর সে দেখতে ঐ পাঞ্জাবীর মত অত হৃষ্টপুষ্টও নয়।

পাঞ্জাবী কুস্তিগিরের আর হনুমান সিং-এর অবস্থা দেখে সকলেই ভাবলে, হনুমান সিং কিছুতেই জিততে পারবে না। পাঞ্জাবীর বন্ধুরা মনে করল, হনুমান সিং ভয় পেয়েছে। এদিকে হনুমান সিং-এর বন্ধুদের কেউ কেউ পাঞ্জাবীর সঙ্গে লড়তে মানা করতে লাগল, কেউ বা খুব ঘি দুধ বাদাম পেস্তা এসব খেতে অনুরোধ করতে লাগল। হনুমান সিং কারু কথায় কান দিলে না, উপোস করলে, গঙ্গাস্নান করলে আর একমনে মহাবীরের নাম জপ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুস্তির দিন এগিয়ে আসতে লাগল। কুস্তির দিনও পাঞ্জাবী পালোয়ান খুব ঘি মাংস আর নানারূপ 'বলকারক খাবার খেলে। আর এদিকে হনুমান সিং সেদিন একেবারে উপোস। কুস্তি দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য। বড় বড় লোক সব হয়েছেন কুস্তির বিচারক।

পাঞ্জাবী পালোয়ান কুস্তির জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। তার বিরাট শরীর দেখে দর্শকেরা অবাক হয়ে গেল। এদিকে হনুমান সিংও ধীরে ধীরে কুস্তির জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হনুমান সিং আজ যেন আর এক নূতন মানুষ হয়ে এসেছে। চোখে তার এক উজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে তার এক শান্ত স্থির ভাব।

কুস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। অধিকাংশ দর্শকই মনে করেছিল হনুমান সিং হারবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অল্প সময়ের মধ্যেই হনুমান সিং পাঞ্জাবী পালোয়ানকে হারিয়ে দিলে।

বিজয়মালা গলায় পরে হনুমান সিং ফিরে এল। পাঞ্জাবী পালোয়ান ও তার বন্ধুগণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না, কি করে হনুমান সিং এত বড় একটি পালোয়ানকে দুমিনিটেই হারিয়ে দিলে।

শরীরের শক্তি বা মনের শক্তির চেয়ে আরো বড় জিনিস আছে, তা আত্মার শক্তি। পবিত্রতা ও সাধনার দ্বারা মানুষের ভিতর সেই শক্তি জাগে। ঘি মাংস বাদাম পেস্তার শক্তি তার কাছে অতি সামান্য।

পণ্ডিত ও গয়লানী

শাস্ত্রের কথা শুধু পাঠ করলে বা জানলেই হয় না। শাস্ত্র বিশ্বাস করে সে ভাবে কর্ম করতে হয়। যারা মুখে বলে এক আর কাজে অন্য রকম করে, তাদের ধর্ম হয় না।

গঙ্গাতীরে এক পণ্ডিত বাস করতেন। পণ্ডিতের অগাধ বিদ্যা আর দেশ-বিদেশে খুব নাম। এক গয়লানী রোজ সকালে তাঁর বাড়িতে দুধ দিত। দুধ দিতে অনেক বেলা হয়ে যায় দেখে একদিন পণ্ডিত গয়লানীকে ধমক দিয়ে বললেন, দুধ দিতে এত দেরি করিস কেন? আরও সকাল সকাল দুধ দিতে হবে।

গয়লানী জোড়হাতে বললে, বাবা, যত সকালে চাও দুধ আমি দিতে পারি। খেয়ানী ঘুম থেকে উঠতে বড্ড দেরি করে। তাইতে আমারও দেরি হয়ে যায়।

পণ্ডিত বললেন, সে আমি জানি নে, আরও সকালে দুধ

দিতে পারিস তো তোর দুধ নেব। নইলে তোর কাছ থেকে নেব না, এই বলে রাঁখলুম।

ভারি চিন্তিত হয়ে গয়লানী বাড়ি ফিরে গেল। বাড়ি তার নদীর ওপারে। অলস খেয়ানীটার জন্যেই তো যত ভাবনা। সেদিন বিকাল বেলা গয়লানী দুধের দাম আনতে আবার পণ্ডিতের বাড়ি গেল। গিয়ে দেখে মস্ত এক সভা। কত বড় বড় লোক বসে আছেন আর পণ্ডিত শাস্ত্র পাঠ করছেন। কি সুন্দর কথা হচ্ছে, সকলে একমনে বসে শুনছে। গয়লানী সব কথা বুঝতে পারলে না। তবুও তার ভাল লাগল। এক পাশে দাঁড়িয়ে সে পাঠ শুনতে লাগল।

পাঠের এক জায়গায় পণ্ডিত বললেন, যে হরিনাম করে, অনায়াসে সে সংসার-সাগর পার হয়ে যায়। এ কথাটা গয়লানীর বড় মনে লেগে গেল। সেদিন আর দুধের দাম নেওয়া হল না। কথাটা ভাবতে ভাবতে গয়লানী বাড়ি ফিরে গেল।

পণ্ডিত বলেছেন দেরি হলে আর দুধ রাখবেন না। গয়লানী তাই পরদিন খুব সকালে দুধ নিয়ে পণ্ডিতের বাড়ি যাত্রা করলে। অনেক ডাকাডাকি করেও যখন খেয়ানীকে অত সকালে ঘুম থেকে তুলতে পারলে না, তখন সে মনে মনে ভাবতে লাগল, পণ্ডিত কাল বলেছেন, হরিনাম করে অনায়াসে সাগর পেরিয়ে যাওয়া যায়। হরিনামে যদি সাগর পাড়ি দেওয়া যায়, তবে এ নদী তো অতি সহজেই পার হওয়া যাবে। আমি কি বোকা!—এই ভেবে মনে মনে হরিকে স্মরণ করে সে নদীতে নেবে পড়ল। সরল

গয়লানী নদী পার হয়ে যাচ্ছে আর পণ্ডিত ডুবে যাচ্ছেন
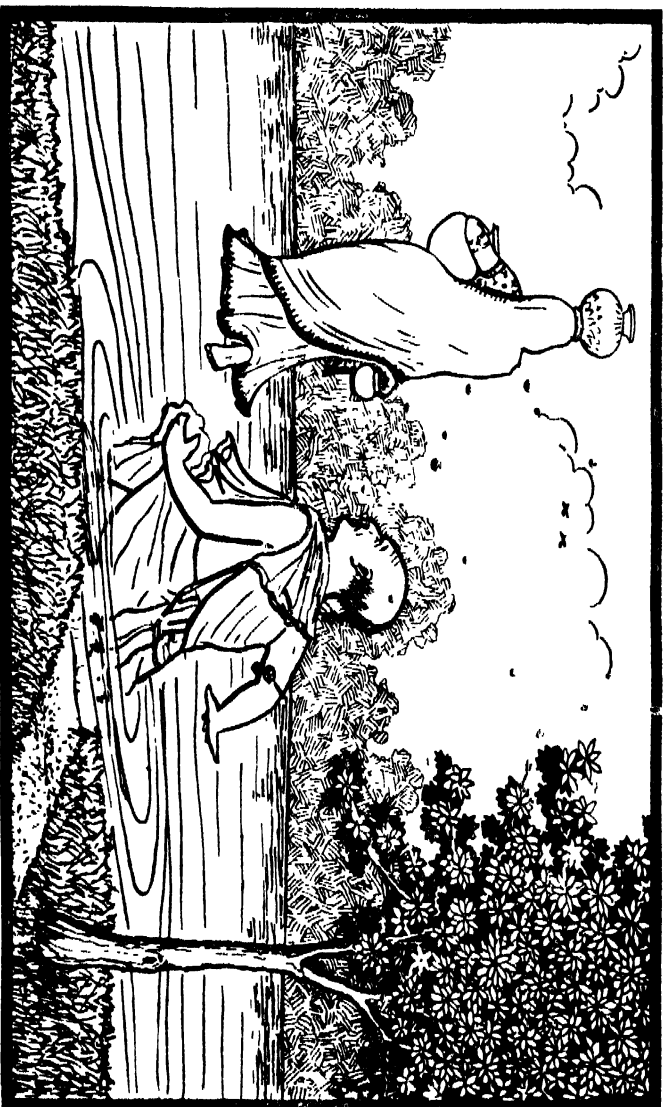
বিশ্বাসের কি আশ্চর্য মহিমা! গয়লানী অনায়াসে পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে গেল।

আজ গয়লানীকে খুব ভোরে আসতে দেখে পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি? আজ এত সকালে কি করে এলি? তোদের যেমন বুদ্ধি! যেমন কুকুর, তেমন মুগুর না হলে হয় না। আজ খেয়ানী কি করে পার করে দিলে?

গয়লানী বললে, খেয়ানী এখনও ঘুমুচ্ছে। সে আমাকে পার করে দেয় নি।

—তা হলে এলি কি করে শুনি? তোর কি দুখানা পাখা গজিয়েছে? আমার সঙ্গে ফাঁকি?

—দেখ, বাবাঠাকুর, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি তোমাকে আবার কি ফাঁকি দেব। তুমিই তো আমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছ।

—বটে, আমি ফাঁকি দিয়েছি?

—হাঁ, তুমিই দিয়েছ। হরিনাম করে যে অনায়াসে নদী পার হয়ে আসা যায়, তা কই, এতদিন তো তুমি আমায় বল নি? ভাগ্যিস কাল বিকেলে এসে তোমার কথা শুনতে পেলুম!

পণ্ডিত তখন সব কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু সত্যিই গয়লানী হরিনাম করে নদী পার হয়ে চলে এসেছে কিনা দেখবার তাঁর ভারি ইচ্ছে হল। তিনি গয়লানীর সঙ্গে সঙ্গে নদীতে গেলেন। গয়লানী হরিনাম করে জলের উপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যেতে লাগল। পণ্ডিতও তার পিছনে পিছনে নাবলেন।

কিন্তু গয়লানীর মত সরল বিশ্বাস পণ্ডিতের নেই। পণ্ডিত মুখে হরিনাম করছেন, আর পাছে কাপড় ভিজে যায় এই ভেবে হাত দিয়ে কাপড় গুটোচ্ছেন। গয়লানী অনায়াসে নদী পার হয়ে গেল, আর পণ্ডিতের সে বিশ্বাস নেই, তিনি নদীতে ডুবে গেলেন।

ভণ্ড ধার্মিক

এক সেকরার দোকান ছিল। দোকানে সেকরাদের দেখলে মনে হয় পরম ধার্মিক। গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলি, মুখে সর্বদা ভগবানের নাম।

সব সেকরাকে বিশ্বাস করা যায় না। খদ্দের যত বুদ্ধিমানই হ'ক না কেন, খারাপ সেকরা তাকে ঠকিয়ে দেবেই। খদ্দেরের কাছ থেকে খাঁটি সোনা নিয়ে তাতে এমন ভাবে সে খাদ মিশিয়ে দেয় যে, সাধারণ লোক তা ধরতে পারে না। এজন্য মানুষ বিশ্বাসী সেকরার দোকান খোঁজে।

এই সেকরাকে ভক্তিমান দেখে মানুষ মনে করত, লোকটি যখন এত ধার্মিক, নিশ্চয়ই সে সোনা চুরি করে না। তাই বহু লোক এই দোকানে কাজ দিতে আসত। দোকানে অনেক কারিগর কাজ করত। দোকানের মালিকের মত সকলেই পরম ধার্মিক!

একদিন কয়েকজন খদ্দের অনেকখানি সোনা নিয়ে সেকরার

দোকানে এসেছিল। মালিক তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। তারপর দামদর ঠিক করে সমস্ত সোনা সে একজন কারিগরের হাতে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কারিগর বলে উঠল, কেশব কেশব। মালিকও তখন বলে উঠল, গোপাল গোপাল।

খদ্দেররা ভাবলে, আহা, এরা কি ধার্মিক লোক, এরা আমাদের কখনও ঠকাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এই সেকরা ছিল ভয়ানক জোচ্চোর ও চালাক। চুরি করবার সুবিধা হবে বলেই সে ধার্মিকের পোষাক নিয়েছিল। মুখে যে হরিনাম করলে, তা হরিনাম নয়, তার অন্য মানে আছে।

কারিগর বললে, কেশব কেশব। প্রকৃত কথাটা কেশব নয়—কে সব। কারিগর মালিককে জিজ্ঞেস করলে, যারা এসেছে, কে সব? এর মানে এরা সব কে? মালিক উত্তর করলে, গোপাল। গো মানে গরু, এরা সব গরুর পাল। মালিক বললে, খদ্দেররা সব গরু, একেবারে বোকা।

তখন আর একজন কারিগর বলে উঠল, হরি হরি হরি। হরিনামে সে ভগবানকে ডাকে নি। সে মালিককে জিজ্ঞেস করলে, হরি হরি। হরি মানে হরণ করি, চুরি করি। সোনা চুরি করবার জন্য কারিগর মালিকের অনুমতি চাইলে।

মালিক উত্তর করলে, হর হর। মানে হরণ কর, চুরি কর। সেকরাদের মধ্যে কিসব কথা হয়ে গেল, খদ্দেররা তার কিছুমাত্রও বুঝতে পারলে না। তারা ভাবলে, আহা, লোকগুলো বড় ধার্মিক,

ভগবানের নাম ওদের মুখে লেগেই আছে। এরা কখনও আমাদের ঠকাবে না।

বহু লোক আছে, যারা কুকাজ করবার জন্তই সাধুর বেশ নেয় ও ধর্মকথা কয়

একমাত্র ঈশ্বরই আপনার

এক সন্ন্যাসীর একজন শিষ্য ছিল। শিষ্যের বাড়ি ঘর মা বাপ স্ত্রী পুত্র সবই ছিল। একদিন গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, একমাত্র ঈশ্বরই তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, আজ্ঞে, মা পরিবার এঁরা আমাকে কত ভালবাসেন, কত যত্ন করেন। আমাকে না দেখলে তাঁরা জগৎ অন্ধকার দেখেন। তাঁরা আমার আপনার নয়?

গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার আপনার নয়।

সন্ন্যাসী তখন একটী ঔষধের বড়ি বের করে শিষ্যের হাতে দিয়ে বললেন, তুমি বাড়ি গিয়ে এ ঔষধটি খেয়ে শুয়ে থেকো। এ ঔষধের গুণ এই, যে খাবে সে ঠিক মরার মত হয়ে যাবে। সকলে মনে করবে লোকটি হঠাৎ মরে গেল। তোমাকেও সকলে তাই মনে করবে। কিন্তু ভিতরে তোমার জ্ঞান থাকবে আর সব তুমি বুঝতে পারবে। তারপর আমি যাব।

শিষ্যটি তাই করলে। বাড়ি গিয়ে ঔষধটি খেয়ে শুয়ে রইল। তাকে হঠাৎ এসে শুয়ে পড়তে দেখে স্ত্রীর মনে সন্দেহ হল। কিছু অসুখ বিসুখ করে নি তো? স্ত্রী ডেকে জিজ্ঞেস করলে, এমন অবেলায় শুয়ে পড়লে যে, কি হয়েছে?

কোন সাড়া নেই। পরিবারটি তখন মহাচিন্তিত হয়ে কাছে গিয়ে দেখলে জীবনের কোন চিহ্ন নেই। তখন—কি হলো গো? আমার কি সর্বনাশ হলো গো,—বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। কান্না শুনে মা আর বাড়ির অন্যান্য সকলে যে যেখানে ছিল দৌড়ে এল। লোকটী মরে গেছে ভেবে সকলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় একজন বৃদ্ধ কবিরাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কবিরাজ বললেন, তোমরা সকলে কাঁদছ কেন? তোমাদের কি হয়েছে?

একজন উত্তর করলে, এ ছেলেটি মারা গেছে।

—ছেলেটির কি হয়েছিল?

—কি যে হয়েছে, তা কেউ বুঝতে পারলে না। কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র বাড়ি এল। কোন অসুখ নেই বিসুখ নেই, হঠাৎ এ সর্বনাশ!

বটে।—আমি একজন কবিরাজ। তা তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি ছেলেটিকে একবার দেখতে পারি কি?

সকলে আগ্রহ করে কবিরাজকে শবের কাছে নিয়ে গেল। কবিরাজকে দেখে সকলের কান্না থেমে গেল। মা ও স্ত্রী মাঝে মাঝে একটু একটু কাঁদছিলেন ও কবিরাজ কি করেন দেখছিলেন। শব পরীক্ষা করে কবিরাজ বললেন, ভাবনার কোন কারণ নেই। আমি একে বাঁচাতে পারব। আমার কাছে এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আছে। খাইয়ে দিলে এখনই ছেলে উঠে বসবে।

এ কথায় সকলেই আনন্দিত। মা ও স্ত্রীর কান্নাও একেবারে থেমে গেল। কবিরাজ একটি ঔষধের বড়ি বের করে বললেন, তবে একটা কথা আছে। একজনকে এ ঔষধটি আগে খেতে হবে। তার পর রোগীকে খাওয়াতে হবে। এ ঔষধের এই নিয়ম। প্রথমে যে ঔষধটি খাবে, সে কিন্তু মরে যাবে। তা দেখছি এর অনেক আত্মীয় পরিজন রয়েছেন। কেউ না কেউ এ ঔষধটি খেয়ে দিতে পারেন।

কবিরাজের কথা শুনে সকলে একেবারে চুপ। কারুর মুখে আর কথাটি নেই। কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে কবিরাজ বললেন, দেরি করবেন না, দেরি করলে ঔষধে ফল না-ও হতে পারে। কে খাবেন এগিয়ে আসুন।

তখনও কেউ আসছে না দেখে কবিরাজ মার কাছে গিয়ে তাঁর হাতে ঔষধটি দিলেন। কবিরাজ বললেন, মা, আর কাঁদতে হবে না। তুমি এ ঔষধটি খাও, তাহলে ছেলেটি বেঁচে উঠবে।

মা ঔষধ হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে। এত বড় সংসার, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, যত্ন করবে, এও ভাবছি।

পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হল। পরিবারও খুব কেঁদেছিলেন। তিনিও ঔষধ হাতে করে ভাবতে লাগলেন। কবিরাজ বললেন, এ ঔষধটি খাও মা লক্ষ্মী। একজনের প্রাণ না দিলে এ ছেলেটিকে বাঁচাতে পারব না।

পরিবার তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওর যা হবার তা তো হয়েছে গো। আমার অপগণ্ডগুলোর এখন কি হবে বল। কে ওদের বাঁচাবে? আমি কেমন করে এ ঔষধ খাই? আমার কপালে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডাবে গো? ও দিদি গো।

কবিরাজ আর কেউ নন, গুরু। শিষ্য শুয়ে শুয়ে সবই শুনছিল। সংসারের অবস্থা দেখে শিষ্য তখনই গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন, ঈশ্বর।

চাষার পণ

একবার ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়েছিল। মাসের পর মাস যায়, জল তো দূরের কথা, আকাশে একটুকরো কালো মেঘও দেখা যায় না। দেশে হাহাকার পড়ে গেছে। বৃষ্টির অভাবে মাঠ শুকিয়ে একেবারে খাঁ খাঁ করছে।

মাঠের মাঝখানে ছিল একটা মস্ত পুকুর। যাদের জমি পুকুরের কাছে, তারা পুকুর থেকে নালা কেটে জমিতে জল নিচ্ছে, আর চাষের চেষ্টা করছে।

যাদের জমি পুকুর খেকে অনেকখানি দূরে, তাদেরও দু একজন জমিতে জল নেবার জন্য চেষ্টা করছে। তারা আজ একটু কাল একটু করে নালা কাটছে। আবার কেউ কেউ আজ এপাশে কাল ওপাশে নালা কাটছে। জমিতে জল নেওয়া আর তাদের হয়ে উঠছে না। তাদের একজন একদিন অনেক বেলা পর্যন্ত নালা কাটছিল। জল নেবার জন্য তার মনে একটু জেদ হয়েছে।

এদিকে আসতে দেরি দেখে বাড়িতে তার পরিবার ভারি চিন্তিত হল। কিছু সময় অপেক্ষা করে সে মাঠে এসে হাজির হল। পরিবার দেখলে চাষা একমনে নালা কাটছে। সে কাছে এসে বললে, এতখানি বেলা হল, নাইবার খাবার নাম নেই, এই রোদে কোদাল মারছ। নাও, আজ ঘরে চল, কাল হবে'খন।

চাষা তার পরিবারের দিকে ফিরে চাইলে, তারপর বললে, আরে, তুই এসেছিস? তা তুই যখন বলছিস, চল ঘরে যাই। কাল হবে'খন।

কিন্তু কাল কাল করে এ চাষারও জল নেওয়া আর হল না।

কোদালখানা কাঁধে করে রামু রোজ সকালে মাঠে যায়। তার জমি পুকুর থেকে অনেকখানি দূর। পুকুর থেকে জল নিয়ে চাষ করা, সেও নেহাৎ সোজা ব্যাপার নয়। পুকুরের পাড়ে বসে বসে সে ভাবে আর আকাশের দিকে চায়। তার ছুটি চোখ ছল ছল করে, ভেবে কিছু কূল-কিনারা সে পায় না। ছেলেমেয়েগুলো শেষকালে কি না খেয়ে মরবে!

একদিন রামু সারারাত ভাবলে। ক্ষেতের ভাবনায় আর ছেলেমেয়েদের কথা মনে করে সে একদণ্ড ঘুমুতে পারলে না। শেষকালে তার মনে ভয়ানক জেদ হল, যে করে পারি কাল ক্ষেতে জল আনবই।

পরদিন সূর্য উঠবার আগেই রামু কোদালখানা নিয়ে মাঠে রওনা হল। তারপর পুকুর থেকে জল নেবার জন্য নালা কাটতে আরম্ভ করলে। নালা কাটছে তো কাটছেই। এদিকে বেলা ছুপুর প্রায় অতীত, মাঠ থেকে চাষারা সব একে একে বাড়ী ফিরে গেছে।

রামুর দেরি দেখে তার পরিবার ভারি চিন্তিত হল। সে তার মেয়েকে ডেকে বললে, যা তো মা, একবার মাঠে। এত

বেলা হল, তবুও আসছে না কেন? যা, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

মেয়ে মাঠে গিয়ে দেখে রামু একমনে মাটি কাটছে। মেয়ে বললে, বাবা, বাড়ি চল, আজ থাক কাল হবে'খন। ভাত নিয়ে মা বসে আছে।

মেয়ের কথা শুনে রামু চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, তুই কি করতে এ রোদে এসেছিস, বাড়ি যা।

মেয়ে—যাব, তুমিও চল। কত বেলা হল, কখন নাইবে, কখন খাবে?

রামু—একদিন নাইতে খেতে একটু দেরি হলে কিছু হয় না রে পাগলী। তুই বাড়ি যা, আমি পরে যাব।

মেয়ে—না, আজ আর কাজ করে দরকার নেই। কাল করবে। এখন বাড়ি চল।

রামু—না, ক্ষেতে জল না গেলে আমি আজ ~~বাড়ি যাচ্ছি~~ নে। শেষকালে তোরা কি না-খেয়ে মরবি? আকাশের অবস্থা দেখছিস তো? শ্রাবণ মাস চলে গেল, এখনও জলের নাম নেই। লক্ষ্মী মা আমার, তুই ঘরে যা। ক্ষেতে জল এনে তবে আমি বাড়ি যাব।

এভাবে অনেক বলে কয়ে রামু তার মেয়েকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। রোদে যেন মাঠে আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে। রামুর গা দিয়ে দর দর করে ঘাম পড়ছে। রামুর সেদিকে খেয়াল নেই। সে আজ ক্ষেতে জল নেবে তবে ছাড়বে।

আরও কত সময় চলে গেল, তবুও রামু ফিরল না দেখে রামুর পরিবার আর স্থির থাকতে পারলে না। রামুকে ডাকতে নিজেই সে মাঠে এল। পরিবার এসেছে রামু একথা জানতেও পারে নি। সে শুধু মাটিই কাটছে।

রামুর কাণ্ড দেখে পরিবারের মনে ভারি রাগ হল। সে বললে, তোমার সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। দুনিয়ার লোক সব মাঠ থেকে কখন বাড়ি ফিরে গেছে। তুমি এখনও মাটি কাটছ। নাও হয়েছে, বাড়ি চল, কাল হবে'খন।

পরিবারের কথায় রামু তার দিকে ফিরে তাকালে, তারপর বললে, তুই আবার কি করতে মরতে এলি? জমিতে জল না নিয়ে আজ আমি বাড়ি ফিরছি নে। হয়ে এল। তুই বাড়ি যা।

রামু তাকে যত বোঝায়, স্ত্রী ততই বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য জেদ করে। কিছুতেই কথা শোনে না দেখে রামু কোদাল নিয়ে তার স্ত্রীকে মারতে গেল। তখন ভয় পেয়ে সে বাড়ি ফিরে যায়। রামু আবার কাজে মন দিলে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এল। রামুর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নালা কাটা শেষ হয়েছে। রামু তাড়াতাড়ি পুকুরপারে ফিরে এসে নালার মুখ কেটে দিলে। তখন কুল্‌কুল করে জল যেতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে রামু খানিকক্ষণ তাই দেখলে। তারপর পুঁটলি থেকে হুঁকো কলকে বের করে তামাক সেজে বসে বসে খেতে লাগল, আর তর তর করে তার ক্ষেতে জল যাচ্ছে তাই দেখতে লাগল।

তারপর বাড়ি গিয়ে পরিবারকে বললে, দে এখন তেল দে, নাইব।

নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রামু ঘুমিয়ে পড়ল।

ধর্মব্যাধ

এক ব্রাহ্মণসন্তান সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যা করছিলেন। একদিন একটি গাছের ছায়ায় বসে তিনি বেদ পাঠ করছেন, এমন সময় গাছের উপর থেকে এক বক তাঁর মাথার উপর মলত্যাগ করলে।

ব্রাহ্মণ রেগে আগুন।—কি, আমার সঙ্গে চালাকি। রেগে তিনি বকের দিকে যেই চেয়েছেন, ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তিতে বকটি একেবারে ভস্ম হয়ে গেল। বকের অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তারপর ভিক্ষার সময় হয়েছে দেখে তিনি গ্রামে এক গৃহস্থের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। গৃহস্থের পরিবার ভিক্ষা দিতে যাবে, অমনি তার স্বামী বাড়ি ফিরে এল। স্বামীকে আসতে দেখে মেয়েটি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দিয়েই তার সেবা করতে লেগে গেল।

ব্রাহ্মণ মেয়ের কাণ্ড দেখে মনে মনে রেগে উঠলেন। তিনি বললেন, আমায় ভিক্ষে দাও। মেয়েটি তখন ভিতর হতে কাতর-কণ্ঠে বললে, ঠাকুর, আমার স্বামী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এসেছেন,

আমি তাঁর সেবা করছি। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে ভিক্ষে দেব।

রেগে আগুন হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! অতিথি ব্রাহ্মণের দিকে না চেয়ে তুমি করছ স্বামীর সেবা! জান, আমি কি করতে পারি?

মেয়েটি বললে, জানি ঠাকুর, আপনি কাক বক ভস্ম করতে পারেন, কিন্তু স্বামি-সেবায় রত সতীর কোন অনিষ্ট আপনি করতে পারবেন না। আপনি বিরক্ত না হয়ে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এই এলুম বলে।

মেয়েটির কথায় ব্রাহ্মণ একেবারে অবাক। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি যখন ভিক্ষা নিয়ে এল, ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি কি করে জানলে, আমি বক ভস্ম করেছি?

মেয়েটি উত্তর করলে, বাবা, স্বামীই মেয়েদের পরম দেবতা। একান্তমনে স্বামি-সেবার দ্বারাই আমার যা কিছু সব হয়েছে। প্রকৃত ধর্ম কি, আপনার যদি জানতে ইচ্ছে হয়, তবে মিথিলার ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে উপদেশ নিন।

মেয়েটির কথায় ব্রাহ্মণ মিথিলায় ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ তখন মাংসের দোকানে বসে মাংস বিক্রি করছিল। দোকানের মধ্যে চারদিকে পশুর মাংস হাড় চামড়া এসব রয়েছে। ধর্মব্যাধের গায়ে হাতে পায়ে রক্ত লেগে আছে। ধর্মব্যাধ ব্যস্ত হয়ে খদ্দেরকে মাংস ওজন করে দিচ্ছে, কারু সঙ্গে দরদস্তুর করছে। ধর্মব্যাধের এ অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণের মন ঘৃণায়

ভরে উঠল। মাগো, এ লোকটার কাছ থেকে আবার ধর্মের উপদেশ নিতে হবে!

ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে ধর্মব্যাধ উঠে দাঁড়িয়ে আদর করে এনে বসালে। ব্যাধ বললে, ঠাকুর, তুমি কেন আমার কাছে এসেছ আমি সব জানি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। দোকানের কাজ শেষ করে বাড়ি গিয়ে আমি তোমাকে সব বলব।

বাজারের শেষে ব্যাধ ব্রাহ্মণকে নিয়ে বাড়ি গেল। বাড়ি গিয়ে স্নান করে আগে তার পিতামাতার সেবা করলে। তারপর এসে ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে বসল। ধর্মব্যাধ অতি সুন্দর সুন্দর ধর্মকথা বলতে লাগল। ব্রাহ্মণ শুনে অবাক। তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না, একটি ব্যাধ, যে পশু-মাংস বিক্রি করে জীবিকা চালায়, কি করে এত ধর্মতত্ত্ব জানতে পারে!

ব্রাহ্মণের মনের কথা বুঝতে পেরে ব্যাধ বললে, দেখ ঠাকুর, ধর্ম কিছু জন্মের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেকের কর্তব্য যদি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা যায়, তবে সকলেই ধর্মপথে উন্নতিলাভ করতে পারে। আমি ব্যাধের সন্তান, আমার কর্তব্য আমি সর্বদাই একান্তমনে পালন করে আসছি। এ ছাড়া আমি তপস্যা করতে বনেও যাই নি, বেদপাঠও করি নি।

ধর্মব্যাধের উপদেশে ব্রাহ্মণসন্তানের জ্ঞান হল।

ছোট বড় কাজ সংসারে কিছুই নেই। যেভাবে কাজ করা যায়, তার উপরই কাজের ফল নির্ভর করে। যে, যেমন মানুষ, সে যদি তার কর্তব্য ঠিক ঠিক করে যায়, তাহলে মহাফল লাভ হয়।

তিন ডাকাত

মানুষের মধ্যে তিনটি গুণ আছে—তম, রজ আর সত্ত্ব। যে অলস, কুঁড়ের বাদশা, তার মাঝে তম বেশি ; যে খুব কাজের লোক, কাজ ছাড়া একটুও স্থির থাকতে পারে না, তার ভিতর রজ বেশি ; আর যে লোক শান্ত স্থির, দুঃখেও যে অস্থির হয় না, তার মধ্যে সত্ত্ব বেশি।

তমর চেয়ে রজ ভাল, আবার রজর চেয়ে সত্ত্ব ভাল। কিন্তু এদের একটিও মানুষকে ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।

একজন পথিক যাচ্ছিল। বনের ভিতর দিয়ে পথ। পথিকের সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা আছে, কিন্তু কেউ সাথী নেই। আবার না গেলেও নয়। পথিক ভয়ে ভয়ে বনের ভিতর দিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তার সামনে দাঁড়াল। পথিক আর কি করে, ভয়ে কাঁপছে, আর মনে মনে দুর্গানাম জপ করছে।

পথিকের সঙ্গে যা কিছু ছিল, সবই ডাকাতরা লুঠ করে নিলে। ডাকাতদের একজন কালো, একজন লাল, অপরটি সাদা। কালো ডাকাত বললে, আমাদের কাজ তো শেষ হল, তবে আর পথিককে রেখে কি হবে? এস, একেও শেষ করে যাই।

কালো ডাকাতের কথায় লাল ডাকাত ভয়ানক আপত্তি করলে। বললে, এর যথাসর্ব্বস্ব তো আমরা কেড়ে নিয়েছি। একে হত্যা করে আমাদের কি লাভ? তার চেয়ে এস, একে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে আমরা চলে যাই।

কালো ডাকাত তাতে আপত্তি করতে চাইছিল, কিন্তু লাল ডাকাতের লাল লাল দুটো চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে আর আপত্তি করলে না। শেষকালে লাল ডাকাত পথিককে লতা দিয়ে এক গাছের সঙ্গে বাঁধলে। তারপর সকলে চলে গেল।

পথিক কি আর করে, চুপ করে অদৃষ্টের কথা ভাবছে। খানিক পরে সাদা ডাকাত আবার ফিরে এল। সাদা ডাকাত বললে, ভাই, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি।

এই বলে সব বাঁধন সে খুলে দিলে। তারপর সাদা ডাকাত বললে, তুমি একটুও ভয় করো না, আমার সঙ্গে এস, তোমাকে শহরের রাস্তায় তুলে দিয়ে আসব।

সাদা ডাকাত আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে, পথিক যাচ্ছে তার পিছনে। সাদা ডাকাতের শান্ত ভাব দেখে পথিকের সব ভয় দূর হয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে ডাকাত বললে, ওই দেখা যাচ্ছে শহর। বরাবর সোজা চলে যাও।

শহর দেখে পথিকের মনে কি আনন্দ! সাদা ডাকাত আবার বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে দেখে পথিক বললে, সে কি মশায়, আপনি যে চলে যাচ্ছেন? আপনি আমার এত উপকার করলেন।
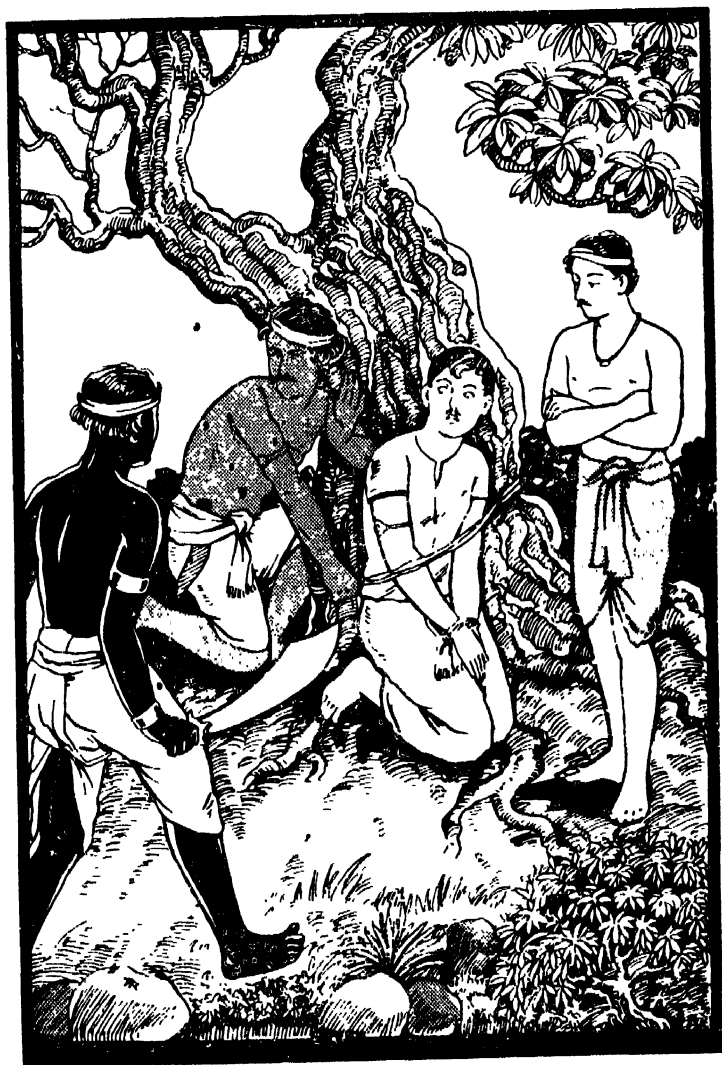
তিন ডাকাত ও পথিক

শহরে আমার বাড়ি আছে। আমার বাড়িতে আপনার একটু পায়ের ধূলো দিতেই হবে।

সাদা ডাকাত বললে, তা হবার যো নেই। শহরে আমার যাবার উপায় নেই। গেলেই পুলিস ধরবে।

এই বলে সাদা ডাকাত চলে গেল।

কৌপীনকা ওয়াস্তে

এক সাধু বনে কুটির বেঁধে তপস্যা করেন। সেখান থেকে গ্রাম খুব বেশি দূর নয়। রোজ সকালে সাধু নদীতে স্নান করে এসে কৌপীনখানা শুকুতে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ভিক্ষায় বেরিয়ে যান। ফিরে এসে দেখেন কৌপীন ইঁদুরে কেটে দিয়েছে।

সাধু ছিলেন খুব ভাল আর তিনি খুব কঠোর তপস্যা করতেন। কাপড় চোপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র তাঁর বেশি কিছু ছিল না। কৌপীনের অবস্থা দেখে তিনি কি আর করেন, গ্রামে গিয়ে আর একখানা কৌপীনের কাপড় লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে করে আনলেন।

পরদিন আবার যত্ন করে কৌপীন শুকুতে দিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন, আবার ইঁদুরে কেটেছে। গ্রামে গিয়ে আবার আর একখানা চেয়ে আনলেন। এভাবে চলল কিছুদিন। রোজ রোজ কে তাঁকে কৌপীনের জন্য কাপড় দেবে? গ্রামের একজন বললে, মহারাজ, এভাবে রোজ রোজ কে আপনাকে

কৌপীন ভিক্ষে দেবে? তার চেয়ে এক কাজ করুন, আমার বাড়িতে খুব শিকারী বিড়ালের বাচ্চা আছে। একটা বাচ্চা নিয়ে যান। ইঁদুর আর উৎপাত করবে না।

সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই, রোজ রোজ কৌপীন কোথা পাব? আর রোজ রোজ এভাবে চাওয়াও ভাল দেখায় না। তা এ লোকটি যা বলছে, মন্দ কি? নিয়ে যাই একটা বিড়ালের বাচ্চা।

সাধু বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে গেলেন।

পরদিন ইঁদুর আর কৌপীন কাটলে না। ভিক্ষে থেকে ফিরে সাধু যখন দেখলেন তাঁর কৌপীন ঠিক আছে, তখন তাঁর মনে বড় আনন্দ হল। কিন্তু এখন আর এক মুশকিল, দুধ ছাড়া বিড়াল-ছানার আহার হয় না। আবার বিড়াল না হলে ইঁদুর তাড়ায় কে? কাজেই বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসীকে আবার ভিক্ষায় বেরুতে হয় একটু দুধের জন্য। এভাবে চলল কিছুদিন।

কিন্তু রোজ রোজ দুধ কোথায় পাওয়া যায়, কেই বা দেয়, আর কেমন করেই বা চাওয়া যায়? আবার হতভাগা বিড়ালটা কিছুতেই খায় না একটু দুধ না হলে। কেবল পায়ে পায়ে ঘোরে আর মিউ মিউ করে ডাকে। দেখে কষ্ট হয়। আবার বিড়াল না হলে কৌপীন রক্ষা করে কে?

গ্রামের লোকে সাধুকে খুব ভক্তি করত। সাধুর অবস্থা জেনে একজন বললে, বাবা, কোন ভাবনা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনাকে আর দ্বারে দ্বারে দুধ ভিক্ষে করে

বেড়াতে হবে না। আমার অনেকগুলো গাই আছে। একটি ভাল গাই আপনি নিয়ে যান। আপনার ওখানে ঘাসের কোন অভাব নেই। গাইএর জন্য আপনাকে বেশি ভাবতেও হবে না। অথচ দুধ যা হবে তাতে বিড়ালেরও হবে, আপনারও সেবা হবে।

সন্ন্যাসী ভাবলেন, মন্দ কি? আমার ওখানে যা ঘাস, একটা কেন তিনটা গরুর স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

একটি গাই সন্ন্যাসী নিয়ে গেলেন। গাইটি বড় লক্ষ্মী। সের পাঁচেক দুধ দেয়। ছোট্ট বাছুরটি যখন কুটিরের সামনে খেলে বেড়ায়, তখন কি সুন্দরই না দেখায়! গাইএর জন্য একখানা ঘরের দরকার। জঙ্গলে খড় বাঁশের অভাব নেই। কজন মজুর হলেই হয়।

সাধু একা আর ঐ তো ছোট্ট বিড়ালের বাচ্চা। পাঁচ সের দুধ নিয়ে সাধু কি করবেন? কিছু বিক্রি করে দিলে হয় না? তাতে যা পয়সা পাওয়া যাবে, তাতেই গাইএর জন্য একখানা ঘর বেশ হয়ে যায়। তাই হল। অতিরিক্ত দুধ রোজই বিক্রি হয়ে পয়সা আসতে লাগল। সে পয়সায় মজুর এল। মজুররা ঘর তৈরি করে দিলে। ছোট্ট হলেও ঘরখানা বেশ সুন্দর হল।

সন্ন্যাসীর সাধন ভজন তপস্যা এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। সময় কই? ঘুম থেকে উঠে গোয়াল পরিষ্কার করতে হয়, গাইকে খাবার দিতে হয়, গাই দুইতে হয়। আবার রায় বাবুদের চাকর দুধ নিতে আসে। সকাল সকাল দুধ না হলে

তাঁদের চলে না। তাই একটু বেশি পয়সা দিয়েই তাঁরা সাধুর কাছ থেকে দুধ নিয়ে যান। গয়লার দুধ, একসেরে আধসের জল। সাধুর দুধ, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তারপর ভিক্ষায় যেতে হয়, ফিরে এসে গাইকে বাছুরকে স্নান করাতে হয়, বিড়ালকে খাওয়াতে হয়, বাছুরকে আটকে রেখে গাইকে বনের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় নদীর ধারে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়। আবার পরদিনের জন্য খানিকটা ঘাসও কেটে রাখতে হয়। এসব সেরে সব দিন ধীরে সুস্থে নিজের চারটি আহার করাই হয়ে ওঠে না। সাধন ভজন তপস্যার সময় কই? গাইএর বা বাছুরের ডাক শুনলে রাত্রিভে আলো জেলে উঠে উঠে দেখে যেতে হয়। বাঘ ভালুকরাও মাঝে মাঝে সে পথ দিয়ে যে যাতায়াত করে।

এক দিন এক ঘটনা হল। ভিক্ষে থেকে ফিরে সাধু দেখেন গোয়ালে বাছুর নেই। ও মা, কি বিপদ! কচি বাছুর কোথা গেল? সারা দুপুর খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল, নদীর ধারে এক ঝোপের ভিতর আরাম করে শুয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। আর একটু ওপাশে গেলেই হয়েছিল আর কি! নদীর পাড়টা ঐখানটায় যেমন উঁচু, তেমনি খাড়া। নদীতে আবার কি স্রোত! পাহাড়ী নদী। ওখানে গেলে আর কি রক্ষে ছিল? কচি বাছুর কিছুই যে বোঝে না। কেবল ভগবানের কৃপায়ই এ যাত্রা বেঁচেছে।

না, এরকম করে আর চলে না। সাধুর তো আর সে

জোয়ান বয়েস নেই। এত খাটুনি পোষাবে কেন? আর শুধু গাইকে নিয়ে থাকলেও তো চলে না, ভিক্ষে আছে, সাধন-ভজন আছে। তা দুধের যা দাম পাওয়া যাচ্ছে, তাতে একটা চাকর বেশ রাখা চলে। একটা চাকর থাকলে গরু বাছুর দেখবে, আর সময়ে অসময়ে সাধুরও একটু আধটু কাজকর্ম করে দিতে পারে—যেমন নদী থেকে দু ঘড়া জল এনে দেওয়া, জঙ্গল থেকে কিছু কিছু কাঠ কেটে এনে দেওয়া, এই সব।

চাকর রাখা হল। সাধু খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। চাকরটি বেশ ভাল, কাজের লোক। অল্প দিনের মধ্যেই সে বাড়ি ঘর সব সাফ করে দুচারটি ফুলের গাছ লাগালে। সাধুর তাতে ভারি আনন্দ। সত্যিই তো, সাধু-সন্ন্যাসীর জায়গা, ফুলগাছ তুলসীগাছ এ সব না হলে কি মানায়? একটা কুমড়ো গাছ আপনা আপনি উঠেছিল। চাকর জঙ্গল থেকে ডালপালা বাঁশ কেটে এনে যত্ন করে মাচা তৈরি করে দিলে। অল্পদিনের মধ্যেই গাছ বেড়ে উঠলো। দেখতে দেখতে ফলে ফুলে মাচা ভরে উঠল। সাধু বললেন, সাবাস বেটা। চাকর উত্তর করলে, বড় চমৎকার মাটি। এখানে সোনা ফলবে। আমি একটু বাগান করব।

তাই তো, ছেলে মানুষ, একটু বাগান করবার সখ হয়েছে। তা করুক না? জায়গাটাও পতিত পড়ে আছে। যদি একটু আধটু শাকসবজি হয়, সে তো ভালই। নানা রকমের বীজ চারা সাধু চেয়ে আনলেন গ্রাম থেকে। চাকরও আনলে।

চাকরের পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই মস্ত বড় শাকসবজির বাগান হয়ে উঠল। দুজন মানুষ, কত আর খাওয়া যায়! সন্ন্যাসী কিছু কিছু বিলিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। চাকর বাজারে বাকিটা বিক্রি করে আসতে লাগল।

সাধুর কুটিরখানা ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল। খড় বাঁশের ঘর কতদিন আর যায়? সাধু বললেন, বাবা রামচরণ, কুটিরখানা তো গেল। কি করা যায় বল্ দেখি?

চাকরের নাম রামচরণ। রামচরণ বললে, আমার কথা যদি শোনেন, বাবা, তা হলে ছোটখাট একখানা পাকা বাড়ি করে ফেলি।

—বলিস কি রে? আশ্চর্য্য হয়ে সাধু উত্তর করলেন।

রামচরণ বললে, আজ্ঞে হাঁ, কত আর খরচ পড়বে? ঐ বিলের কাছে নীচু জমিতে ভাল ইট তৈরী হবে। নিজেরা ইট করিয়ে নিলে খরচ ঢের কম পড়বে। এ খড়ো ঘর। তার পিছনে লেগেই থাকতে হয়। আজ বেড়া বাঁধ, কাল খুঁটি বদলাও, পরশু চাল মেরামত কর। আপনি সাধু মানুষ, এত ঝঞ্ঝাট কি আপনার পোষায়! তারপর আজকাল আমাদের হাতে দুটি পয়সা আছে। দেশে যা চোর ডাকাতের ভয়। এ ঘরে চুরি হতে কতক্ষণ?

সাধু ভাবতে লাগলেন, রামচরণ যা বলছে মিথ্যে নয়। ছেলেমানুষ হলেও রামচরণের মাথা অতি চমৎকার। এরকম বুদ্ধি বিবেচনা সকলের হয় না। তা, একটা ছোটখাট বাড়ি

করতে কত আর খরচ পড়বে? তা ছাড়া, সাধুমানুষ দেখে সকলেই খাতির করে।

ইটের কাজ আরম্ভ হল। এদিকে রামচরণ চাষ করতে আরম্ভ করেছে। রামচরণ ছেলেমানুষ। তার উৎসাহ দেখে সাধু কিছু বললেন না। বাধা দিলে যে ভারি দুঃখিত হবে। এজন্যই তো তিনি তাকে নিরুৎসাহ করেন না। রামচরণকে সন্ন্যাসী এক জোড়া বলদ কিনে দিয়েছেন, লাঙল কোদাল এসব কিনে দিয়েছেন। আবার জমিদারের কাছ থেকে বিলের ধারের অনেকখানি ধেনো জমিও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

বাড়ির কাজ ধীরে ধীরে অনেকখানি এগিয়ে এল। এদিকে রামচরণও অনেক উন্নতি করলে। চাষ আবাদ পুরাদমে চলল। আরও অনেকগুলো চাকর রাখা হল। আট দশ জোড়া হালের বলদ কেনা হল। গোলাভরা ধান। বাগানভরা শাক-শবজি। গোয়ালভরা গরু। কি ছিল আর কি হয়েছে!

সাধুর জন্যে যে পাকা বাড়ি তৈরী হয়েছিল, তাতে কুলোয় না। তিনি সেটি চাকরদের ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর জন্য আরও মস্ত বাড়ি আরম্ভ হল। সামনে মস্ত বড় পুকুর কাটা হল আর পাঁচিল উঠল বাড়ির চারদিকে। শত শত জন মজুর খাটতে লাগল। সাধুর একদণ্ডও অবসর নেই। নিজে না দেখলে কিছুই যে হয় না। তবে রামচরণ কাজের লোক বটে।

সে ছিল বলেই ক্ষেতের কাজটা তাঁকে আর দেখতে হত না। হাজার হাজার মণ ধান বছরে যে বিক্রি হচ্ছিল, সে তো রামচরণের জন্যেই।

চাকরদের জন্যে আশে পাশে আরও দুচারখানা বাড়ি তৈরী হল। তারপর ধীরে ধীরে চার পাশে অনেক প্রজাও বসতে লাগল। দেখতে দেখতে সারা বন গ্রামে পরিণত হল।

সাধুর তখন অনেক প্রজা, অনেক ধনসম্পত্তি। তাই কর্মচারী দাসদাসী সবই রাখতে হল। ফটকে দারোয়ান পাহারা দিতে লাগল। কত লোকের সঙ্গে কারবার চলল। কত বড় বড় লোক এসে দেখা করতে লাগল।

পশু অভ্যাসবশে কাজ করে আর মানুষ প্রতি কাজ বিচার ক'রে করে। এতেই পশুতে ও মানুষে তফাৎ। বিচার করলে কি হবে? মানুষের বিচার সব সময় ঠিক হয় না। আমাদের মন আমাদের যত ফাঁকি দেয়, এরূপ আর কেউ পারে না। আমরা যখন ধীরে ধীরে অধঃপাতে যাই, অন্যায়ের পথে যাই, তখনও আমাদের মন নানারূপ যুক্তি দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আমরা সবই ভাল করছি।

সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসী নেই। তিনি হলেন জমিদার মহাজন ধনী বিষয়ী। কত তাঁর দাসদাসী, কত তাঁর জাঁকজমক! এ ভাবে কিছুদিন গেল। একদিন সাধুর গুরুদেব শিষ্যের খোঁজে এলেন। বহুদিন ধরে শিষ্যের কোন সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন

না। এসে দেখলেন, সে বন নেই, সে কুটির নেই, সেখানে হয়েছে মস্ত বড় গ্রাম। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সেই সাধুই এখন এ বিরাট বাড়ি ঘর ধন জন সম্পত্তির অধিকারী।

শিষ্যের অবস্থা গুরু সবই বুঝতে পারলেন। কোথাও না থেমে একেবারে তিনি বৈঠকখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাধু কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। দূর থেকে গুরুদেবকে দেখে চিনতে পারলেন আর দৌড়ে এসে প্রণাম করলেন। বাড়িঘরের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কি?

শিষ্য যোড়হাতে উত্তর করলেন, গুরুদেব, এসব যা দেখছেন, সবই এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।

এক কৌপীনকা ওয়াস্তে মানে এক কৌপীনের জন্য। গুরুর দর্শনে শিষ্যের মনে জ্ঞানের উদয় হল। তিনি বুঝতে পারলেন, কোন্ পথে তিনি যাচ্ছিলেন। বাড়িঘর সব ছেড়ে তখনই তিনি গুরুর সঙ্গে তপস্যায় চলে গেলেন।

আমবাগান

এক বড় লোকের মস্ত বড় এক আমবাগান ছিল। বড়-লোকদের নানা সখ থাকে। এই ভদ্রলোকটির ছিল আমের বড় সখ। তিনি বহু দেশ বিদেশ থেকে নানা রকম ভাল ভাল আমের কলম আনিয়ে তাঁর বাগানে লাগিয়েছিলেন। বাগানের জন্য তাঁর যত্নের অন্ত ছিল না। আমের সময় গাছে গাছে আম কি সুন্দরই না দেখাত! ছোট বড় গোল লম্বা লাল হলদে কত রকম আম!

একবার আমের সময়, গাছে গাছে তখন আম পেকে আছে, দুইটি বন্ধু আমবাগান দেখতে গিয়েছিল। দারোয়ান বললে, বাবুর হুকুম, যার ইচ্ছে বাগান দেখতে পারে, যত খুশি আম পেড়ে খেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যের পর কেউ বাগানে থাকতে পারবে না বা সঙ্গে করে বাড়িতে আম নিয়ে যেতে পারবে না। আপনারা যদি ইচ্ছে করেন, ভিতরে যান বাবু, আর যত খুশি আম পেড়ে খান।

বন্ধুদের ছিল দুজনের দুরকম স্বভাব। একজন মনে করত, তার মত বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। সে বড় হিসেবী লোক। প্রত্যেক কাজেই সে কেবল লাভ লোকসান হিসাব করত। কোন কাজ করতে যাবার আগে সে কেবল হিসাব নিয়েই

থাকত, তার দ্বারা আর কাজ করা হত না। অপর বন্ধুটি ছিল একটু সোজা ভাবের। সে অত হিসাবের ধার ধারত না। কি করবে না করবে ঠিক করে সে কাজে লেগে যেত। কাজই সে সর্বদা ভালবাসত।

মনের আনন্দে দুই বন্ধু বাগানের ভিতর প্রবেশ করলে। চালাক বন্ধুটি বাগানে ঢুকেই হিসাব করতে আরম্ভ করে দিলে। দেখলে, বাগানের গাছগুলো যেখানে সেখানে লাগান হয় নি, সারি করে লাগানো হয়েছে। বাগানে সত্তরটি সারি আছে। প্রত্যেক সারিতে পঞ্চাশটি করে গাছ। সুতরাং সবশুদ্ধ বাগানে সাড়ে তিন হাজার গাছ আছে। আচ্ছা, যদি প্রত্যেকটি গাছে মোটামুটি ধরা যায় এক শ করে ডাল আছে, তা হলে দাঁড়াল—বাগানে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার ডাল। প্রত্যেকটি ডালে যদি কমপক্ষে পঞ্চাশটি করেও আম ধরে, তা হলে বাগানে সবশুদ্ধ মোট সাড়ে সতের লক্ষ আম ফলেছে।

লোকটি পকেট থেকে নোট বই ও পেনসিল বের করে একটি গাছের নীচে বসে আঁক কষতে লেগে গেল। খুব মন দিয়ে সে হিসাব করতে আরম্ভ করলে, যেন কোথাও ভুল না হয়।

বাবুদের খাবার জন্য, চাকর-বাকরদের, দর্শকদের, কাক বাদুড় সকলের জন্য কিছু কিছু আম বাদ দেওয়া হল। তার পর টাকায় কুড়িটা করে বিক্রি করলে মোট কত টাকা পাওয়া যাবে,

তাও বের করা হল। সেই টাকা থেকে জমির খাজনা, নতুন কলমের দাম, কোদাল খুন্তি, চারদিগের বেড়া, দারোয়ান মালী চাকরদের মাইনে প্রভৃতি বাদ দেওয়া হল। তারপর মোট কতটাকা লাভ দাঁড়াল, আঁক কষে বন্ধু তাই বের করলে।

বন্ধুটি আঁক কষতে কষতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। কোথাও ভুল হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে আবার গোড়া থেকে আঁক কষতে আরম্ভ করলে। এদিকে অপর বন্ধুটি পেট ভরে আম খেয়ে বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বন্ধুর পাণ্ডিত্য দেখছে।

এমন সময় দারোয়ান এসে বললে, বাবুরা বাইরে আসুন। ফটক বন্ধ করবার সময় হয়েছে। দুই বন্ধু বাইরে চলে গেল।

বুদ্ধিমান বলে যার অহঙ্কার সে শুধু হিসাবই করলে। কিন্তু অপর বন্ধুটি হিসাবে না গিয়ে পেট ভরে আম খেয়ে নিলে। সে-ই যথার্থ লাভ করলে। প্রকৃত বুদ্ধিমান সে-ই।

দুহাত তুলে নাচ

দুই বেয়ান ছিল। সাদা বেয়ান আর কালো বেয়ান। অনেক দিন হয়ে গেল, দু বেয়ানে দেখাশুনা নেই। তাই একদিন কালো বেয়ান সাদা বেয়ানকে দেখতে গেল। সাদা বেয়ান তখন বসে বসে রেশমের সুতো কাটছিল। কালো বেয়ানকে অনেক দিন পর দেখে তাঁর ভারি আনন্দ হল। খুব আদর করে তাঁকে বসালে। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর সাদা বেয়ান, বললে, তোমাকে দেখে আমার আজ কি আনন্দ যে হচ্ছে, বেয়ান, তা কি আর বলব? তুমি বস। আমি যাই, তোমার জন্য কিছু জলখাবার আনিগে।

এই বলে সাদা বেয়ান ভিতরে চলে গেল। এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতো দেখে কালো বেয়ানের ভারি লোভ হল। সে নাড়াচাড়া করে সব সুতোগুলো দেখতে লাগল। শেষে লোভ সামলাতে না পেরে এক তাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে।

সাদা বেয়ান জলখাবার নিয়ে এল আর কালো বেয়ানকে খুব আদর করে খাওয়াতে লাগল। হঠাৎ সুতোর দিকে চেয়ে দেখলে একতাড়া সুতো যেন কম। বেয়ানকে খাওয়াতে খাওয়াতে সে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলে

একতাড়া সুন্দর রেশম কালো বেয়ান বগলে লুকিয়েছে। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দি করলে। সাদা বেয়ান যে কালো বেয়ানের কাণ্ডটি টের পেয়েছে, একথা তাকে সে বুঝতে দিলে না। বেয়ানকে সে খুব আদর করে খাওয়াতে লাগল, আর কত গল্প করতে লাগল, কত পুরনো কথা, কত সব।

তারপর সাদা বেয়ান কালোকে বললে, ভাই, এত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। আজ আমার ভারি আনন্দের দিন।

কালো বললে, আমারও ভারি আনন্দ হচ্ছে।

সাদা বললে, আমার ভারি ইচ্ছে করছে দু বেয়ানে একটু নাচি।

তখন দুজনে মিলে নাচতে আরম্ভ করলে। সাদা বেয়ান দেখলে, কালো বেয়ান একহাতে বগল টিপে খুব সাবধানে নাচছে। তখন সে বললে, এস, আমরা দুহাত তুলে নাচি।

এই বলে সাদা বেয়ান দুহাত তুলে নাচতে আরম্ভ করলে। কিন্তু কালো বেয়ান একহাতে খুব সাবধানে বগল টিপে শুধু একহাত তুলে নাচতে লাগল।

তখন সাদা বেয়ান বললে, সে কি বেয়ান? এক হাত তুলে আবার কি নাচ? দুহাত তুলে না নাচতে পারলে কি তেমন আনন্দ হয়?

কালো বেয়ান মুখ ভার করে বললে, কি করি ভাই, যে যেমন জানে। সকলে কি আর তোমার মত দুহাত তুলে নাচতে পারে?

বাজিকর

মনই সব। শকুনি কত উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তার মন থাকে কোথায়? কোথায় গরু মরেছে, কোথায় কুকুর বিড়াল মরেছে। এরকম অনেক লোক আছে, যারা অনেক বড় বড় কথা বলে বা বড় কাজ করে কিন্তু তাদের মন থাকে ছোট ছোট বিষয়ে। তাদের বিশেষ উন্নতি হয় না।

অনেক দিনের কথা। একজন বাজিকর বাজি দেখাচ্ছিল রাজদরবারে। রাজা পাত্র মিত্র সব বসে বাজিকরের বাজি দেখছেন। বাজিকর কত রকম খেলা দেখাচ্ছে আর মাঝে মাঝে

চীৎকার করে বলছে, লাগ্ ভেলকি লাগ্, রাজা, কাপড়া দেও, রুপিয়া দেও, লাগ্ ভেলকি লাগ্।

সকলে অবাক হয়ে বাজি দেখছে। হঠাৎ একটা বিপদ হল। বাজি দেখাতে দেখাতে বাজিকরের তালুর কাছে জিবটা কি রকম উলটে গেল। এরূপ হলে মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ মরে না। দেখলে মনে হয় মরে গেছে। এভাবে শরীর বহুদিন থাকে। এ অবস্থায় মানুষের জ্ঞান থাকে না, আবার শরীরও নষ্ট হয় না।

জিব উলটে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার নাম কুম্ভক। বাজিকরের জিব উলটে গেল। তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সে বসে পড়ল আর দেখতে না দেখতে তার শরীর একেবারে মরার মত হয়ে গেল। সকলে মনে করলে, বাজি দেখাতে গিয়ে কি গোলমাল হয়ে লোকটা হঠাৎ মরে গেল। তারপর রাজার আদেশে একটা ইটের কবর তৈরি করে তাকে সেভাবেই পুঁতে রাখা হল।

তারপর হাজার বছর কেটে গেছে। সে রাজা নেই, সে রাজ্য নেই, সে রাজবাড়ি নেই। আগে যেখানে রাজবাড়ি ছিল সেখানে হয়েছে পতিত জমি। কতকগুলো চাষা সেই জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষের উপযোগী করবার জন্য মাটি কেটে সমান করতে লাগল।

যেখানে বাজিকরের কবর ছিল, সে জায়গাটা একটু উঁচু হয়ে ছিল। চাষারা সেখানকার মাটি কাটতে কাটতে দেখে,

একটা কবর আর তার ভিতর একটা মানুষ বসে আছে। সকলে ধরাধরি করে তাকে উপরে ওঠালে।

ধরাধরি করে ওঠাবার সময় নাড়াচাড়া খেয়ে বাজিকরের জিব তালু থেকে সরে গেল। তখন তার আবার জ্ঞান ফিরে এল। তখন চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করলে, লাগ্ ভেলকি লাগ্, রাজা কাপড়া দেও, রুপিয়া দেও, লাগ্ ভেলকি লাগ্।

কোদাল লাঙল সব ফেলে চাষারা যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বাজিকর তখনও বলছে, কাপড়া দেও, রুপিয়া দেও, লাগ্ ভেলকি লাগ্।

যোগীরা কুম্ভক করে মন স্থির করেন। তখন তাঁরা হৃদয়ে ভগবানের দর্শন পান। বাজিকরের মন ঈশ্বরের দিকে ছিল না। তাই এত উঁচু অবস্থা লাভ করেও তার কিছুই লাভ হল না।

ভাগবত পণ্ডিত

এক পণ্ডিত রাজাকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। খুব বড় পণ্ডিত। অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, মস্ত বিদ্বান। রাজাও খুব ভক্তিমান। পাঠের সময় মাঝে মাঝে পণ্ডিত রাজাকে জিজ্ঞেস করতেন, মহারাজ, বুঝেছেন? রাজা উত্তর করতেন, পণ্ডিত মশায়, আগে আপনি বুঝুন।

রাজার মনের ভাব পণ্ডিত বুঝতেন না। তাঁর মত এত

অগাধ বিদ্যা দেশের আর কোন পণ্ডিতের নেই। ভগবতের সংস্কৃত কথাগুলোর মানে না বোঝবার কি আছে? পণ্ডিত নিজেও কত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন।

যা হ'ক পণ্ডিত রাজসভায় ভগবত পাঠ করে যান। কঠিন কঠিন জায়গাগুলো খুব ভাল করে ব্যাখ্যা করেন। রাজা একমনে ভাগবত শোনেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন কিনা তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যেত না। পণ্ডিত আবার জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, আপনি বুঝতে পেরেছেন? আবার সেই উত্তর, আগে আপনি বুঝুন।

রাজার কথায় পণ্ডিত অবাক হয়ে যান। তিনি ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারেন কিন্তু রাজার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন না। বাড়ি গিয়ে পণ্ডিত একমনে ভাগবত পাঠ করেন। পরদিন আবার রাজসভায় আসেন। পাঠের সময় পণ্ডিত রাজাকে প্রশ্ন করেন; রাজা আবার সেই উত্তর দেন, আপনি আগে বুঝুন।

পণ্ডিতের মনে কি রকম খটকা লাগল। বাড়ি গিয়ে খুব একমনে ভাগবত পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। আজ পণ্ডিতের কি হল! যতই পাঠ করেন, ততই তাঁর ভাল লাগে, ততই যেন নতুন অর্থ খুঁজে পান। তাঁর মনে হতে লাগল, সত্যি এতদিন তিনি ভাগবত বুঝতে পারেন নি। পণ্ডিত যত পড়েন, ততই তাঁর ভাল লাগে।

পণ্ডিতের রাজবাড়ি যাওয়া ভুল হল, ধীরে ধীরে খাওয়া

ভুল হল, ঘুম ভুল হল। রাতদিন ভাগবত নিয়ে বসে থাকেন। পড়েন আর দুচোখে অবিরাম ধারা বেয়ে পড়ে।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়, ভাগবত পণ্ডিত আর রাজবাড়ি আসেন না। রাজা ভাবেন পণ্ডিতের কি হল? দেখতে দেখতে আরও কিছুদিন কেটে গেল, ভাগবত পণ্ডিত তবুও রাজাকে ভাগবত শোনাতে এলেন না।

রাজার মনে সন্দেহ হল। তিনি ছদ্মবেশে একদিন ধীরে ধীরে পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখেন, পণ্ডিত একাকী বসে ভাগবত পাঠ করছেন আর চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে পড়ছে। রাজা গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতের সে খেয়াল নেই। তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর হয়ে ভাগবত পাঠ করছেন। এ অবস্থা দেখে রাজার মনে বড় ভক্তির উদয় হল। তিনিও একপাশে বসে একমনে ভাগবত শুনতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিতের পাঠ শেষ হল। রাজা গিয়ে তখন পণ্ডিতকে মাটিতে পড়ে প্রণাম করলেন। পণ্ডিত রাজাকে দেখে চিনতে পারলেন, বললেন, মহারাজ আপনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

গণেশের মাতৃভক্তি

ভগবতীর ছুই ছেলে, কার্ত্তিক ও গণেশ। তাঁদের বাড়ি কৈলাসে। ভগবতী একদিন একটি অতি সুন্দর মুক্তো হার গলায় পরে বসেছিলেন। হার দেখে ছু-ভাইএর মধ্যে মহা বিবাদ। গণেশ বললেন, মা, আমাকে দাও। কার্তিক বললেন, মা, আমাকে দাও। মা পড়লেন মহা বিপদে, কাকে রেখে তিনি কাকে দেন। শেষকালে তিনি বললেন, দেখ, তোমরা ছু-ভাইএর মধ্যে যে আগে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে পারবে, তাকেই আমি এ হার পুরস্কার দেব।

মার কথা শুনে কার্তিকের মনে বড় আনন্দ। তিনি তাঁর বাহন ময়ূরে চড়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করতে। কার্তিকের বিশ্বাস তিনিই হার পাবেন। কারণ গণেশদাদা একে মোটা মানুষ, তাতে তাঁর বাহনটিও আবার ইঁছুর। সুতরাং কার্তিকের আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসা দাদার কর্ম নয়।

এদিকে গণেশ করলেন কি? উঠে ধীরে ধীরে মাকে প্রদক্ষিণ করে আসলেন। মার চরণে প্রণাম করে তিনি বললেন, মা, তুমি মহামায়া, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুমিই সৃজন করেছ। আবার তোমার মাঝেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। তোমাকে প্রদক্ষিণ করলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হল।

ভগবতী গণেশের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন

অনেকক্ষণ পরে কার্তিক ফিরে এলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গণেশ হারবেন আর তিনি হার পাবেন। গণেশকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাট্টা করে কার্তিক বললেন, কি দাদা, তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ হয়ে গেল? গণেশ ধীরে উত্তর করলেন, হাঁ ভাই, হয়েছে। মিছে কথা বলবার লোক গণেশ-দাদা নন। গণেশের কথায় কার্তিক আশ্চর্য হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, সে কি রকম? তখন গণেশ বললেন, ভাই, বিশব্রহ্মাণ্ড যা বলছ, সবই যে আমার মার মধ্যে। মা ছাড়া কোন্ বস্তুটি আছে বল। তাই আমি মাকে প্রদক্ষিণ করেছি এবং তাতেই আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ হয়ে গেছে।

গণেশের জ্ঞান ও মাতৃভক্তি দেখে ভগবতী বড় সন্তুষ্ট হলেন। নিজে গলা থেকে হারটি খুলে গণেশের গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। কার্তিক নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সর্বমঙ্গলা

সরলভাবে ভগবানকে একমনে ডাকলে তিনি দেখা দেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ তাঁর দেখা পেয়েছিল। তিনি জটিল বালকের সাথে রোজ এসে খেলা করতেন। আমাদের দেশের কত সাধুপুরুষ যে ভগবানের দেখা পেয়েছেন, তা বলে শেষ করা যায় না।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব। গরীব হলেও ব্রাহ্মণ বড় ভক্ত। একমনে তিনি দেবীর পূজো করতেন। লোকের বাড়ি চণ্ডীপাঠ করে যা পেতেন, তাতেই তাঁর দিন একরকম কেটে যেত। ব্রাহ্মণের একটি মেয়ে ছিল। তার নাম সর্বমঙ্গলা। সর্বমঙ্গলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তার মত সুন্দর এবং কাজকর্মে স্বভাবচরিত্রে রান্নাবান্নায় এমন মেয়ে সে দেশে একটিও পাওয়া যেত না। একদিন সে দেশের জমিদার কি কাজে সে গ্রামে আসেন। মেয়েটি তাঁর চোখে পড়ে। মেয়েটিকে দেখে তাঁর এত ভাল লাগল যে, তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর সর্বমঙ্গলা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে বড় ভালবাসতেন। মেয়ে শ্বশুরঘর চলে যাবার পর তাঁর মনে ভারি কষ্ট হতে লাগল। কি করেন, বিয়ের পর মেয়ে যে পর হয়ে যায়। সর্বমঙ্গলার জন্য ব্রাহ্মণের মনে

যতই কষ্ট হতে লাগল, ততই তিনি পূজোয় ও চণ্ডীপাঠে মন দিলেন। বহু ভাগ্যে মেয়ে বড় ঘরে পড়েছে।

দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণের মনে ভারি ইচ্ছে তিনি মার পূজো করবেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি একথা বললেন। একথায় স্ত্রীও খুব আনন্দিত হলেন। তবে তাঁরা যে বড় গরীব, কি দিয়ে মার পূজো করবেন? তিনি স্বামীকে একথা বললেন। ব্রাহ্মণ তাতে উত্তর করলেন, কি? মা কি তবে শুধু ধনীদেরই মা, গরীবেরা তাঁর কেউ নয়? তা হতেই পারে না! আমার ঘরে খুদ কুঁড়ো যা আছে, তা দিয়েই আমি মার পায়ে দুটি ফুল দেব।

শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, তা তোমার যখন বাসনা হয়েছে তখন মার পূজো হবে বই কি!

পূজোর আর দেরি নেই, স্বামী স্ত্রী দুজনে অতি কষ্টে বারটি টাকা সংগ্রহ করেছেন। ব্রাহ্মণ একটি আধুলি নিয়ে কুমোর-বাড়ি গেলেন। কুমোরকে বললেন, বাপু, এ আধুলিটি রাখ, আর আমাকে ছোট করে মার একখানি প্রতিমা গড়ে দাও।

কুমোর বললে, ঠাকুর, আপনি পাগল হয়েছেন। দুর্গাপূজা করবার আপনার অবস্থা কোথায়? আর আট আনায় কখনও প্রতিমা হয়?

ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন, কেন বাপু, মার পায়ে দুটি ফুল দেব, তাতে অবস্থা অনবস্থায় কি হবে? এই আট আনাতে যা হয়, এমনি একখানি প্রতিমা তুমি করে দাও।

ব্রাহ্মণের মনের ভাব দেখে কুমোরের ভক্তি হল। সে বললে, আচ্ছা, প্রতিমা আমি করে দিচ্ছি। আধুলির দরকার নেই। আমি অমনি করে দেব।

ব্রাহ্মণ বললেন, সে হয় না বাপু, তোমাকে পয়সা নিতেই হবে।

জোর করে তিনি আধুলিটা দিয়ে আসলেন।

সর্বমঙ্গার কথা ব্রাহ্মণীর মনে হয়। তিনি কাঁদেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কেঁদে আর কি হবে? তাঁরা বড়লোক, তাঁদের বাড়িতে কত বড় পূজো হবে। তাঁদের একমাত্র সন্তানের বউ। তাঁরা দেবেন কেন?

ব্রাহ্মণী মনকে বোঝাতে চান, কিন্তু মার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

কুমোর একখানি সুন্দর প্রতিমা গড়ে দিলে। পূজোর আর একদিন মাত্র বাকি। কিন্তু একটা বিপদ হল, ব্রাহ্মণী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘরে মেয়েছেলে আর একজনও নেই। ব্রাহ্মণী বললেন, ওগো, তুমি একটিবার আমার সর্বমঙ্গলার বাড়ি যাও না? অগত্যা ব্রাহ্মণকে মেয়ের বাড়ি যেতেই হল। কিন্তু মেয়েকে তাঁরা দিলেন না।

দুঃখিত অন্তরে ব্রাহ্মণ ফিরে আসলেন। জমিদার-বাড়ি থেকে তিনি একটুখানি এসেছেন, অমনি পিছনে শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডেকে বলছে, বাবা বাবা, আমি এসেছি, আমাকে নিয়ে যাও। কথাগুলো যেন সর্বমঙ্গলার। চমকে উঠে তিনি

পিছনে তাকালেন। দেখেন, সত্যিই সর্বমঙ্গলা। ব্রাহ্মণ বললেন, সে কি মা, তুমি চলে এলে, তোমার শাশুড়ী কি বলবেন ?

সর্বমঙ্গলা বললে, সে তোমায় ভাবতে হবে না বাবা, আমি সব ঠিক করে এসেছি।

মেয়েকে পেয়ে মার অসুখ অনেকখানি যেন সেরে গেল। সর্বমঙ্গলা সারা বাড়ি আনন্দ করে বেড়াতে লাগল। মেয়ে যেন আরও উজ্জ্বল আরও সুন্দর হয়েছে। মা বাবা চেয়ে দেখেন, তাঁদের মনে আনন্দ ধরে না। আহা, বাছা বড় ঘরের বউ হয়েছে, তবুও যেমন তেমনটিই আছে। বাছার কপালের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হ'ক।

পূজোর ছুদিন অতি সুন্দরভাবে কেটে গেল। তৃতীয় দিন সর্বমঙ্গলা তার বাবাকে বললে, বাবা, পাড়ার লোকদের খাওয়াতে হবে। ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, খাওয়াতে তো হবে, মা, কিন্তু কি দিয়ে খাওয়াব ? তোমার বাবার কি সে ক্ষমতা আছে, মা ?

সর্বমঙ্গলা উত্তর করলে, না বাবা, তুমি বাড়িতে পূজো এনেছ, পাড়ার সকলকে না খাওয়ালে কি মানায় ?

এই বলে সর্বমঙ্গলা পাড়াতে চলে গেল। ব্রাহ্মণ মনে মনে হাসলেন, মার আমার বড় ঘরে গিয়ে নজরও বড় হয়ে গিয়েছে।

ব্রাহ্মণ স্নান করে পূজায় বসলেন। সর্বমঙ্গলা তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। ঠাকুরপ্রতিমা যেন জ্বল জ্বল করছে।

দেবীর জ্যোতিতে সমস্ত বাড়িখানি আলো হয়ে উঠেছে। দুপুর বেলা পাড়ার লোকেরা দলে দলে এসে উপস্থিত। সর্বমঙ্গলা সকলকে ফলারের নেমন্তন্ন করে এসেছে।

ব্রাহ্মণ বললেন, দেখেছ, পাগলা মেয়ের কাণ্ড! ব্রাহ্মণী ভাবলেন, তাই তো কি হবে? সর্বমঙ্গলা বললে, তোমরা কিছু ভেবো না বলছি। আমি সকলকে ডেকে এনেছি, মার প্রসাদ খাওয়াব।

ব্রাহ্মণ সকলকে আদর যত্ন করে বসালেন, তারপর ঠাকুর-ঘরে গিয়ে একমনে ডাকতে আরম্ভ করলেন,-মাগো মা, লজ্জা নিবারণ কর।

এদিকে সর্বমঙ্গলা সকলকে সমাদর করে বসিয়ে দেবীর প্রসাদ আনলে। সকলকে বললে, আমার বাবা বড় গরীব। আপনাদের যোগ্য সমাদর করবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আপনারা দয়া করে তাঁর বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, এটি তাঁর পরম সৌভাগ্য। আপনারা সকলে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করুন।

প্রসাদ থেকে এমন একটি সুগন্ধ বের হতে লাগল, যাঁরা খেতে বসেছেন সকলে তার গন্ধে পুলকিত হয়ে উঠলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই বললেন, এমন প্রসাদ তাঁরা কখনও খান নি, আর অল্পেতেই তাঁদের পেট এমন ভরে গেছে যে বলবার নয়। তখন সকলে আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সর্বমঙ্গলা বাবাকে ডাকলে, বাবা, উঠে এস। তাঁরা সব বাড়ী চলে গেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁরা সকলে আমাকে শাপ দিয়ে গেলেন কি মা?

সর্বমঙ্গলা বললে, শাপ কেন দেবেন? সকলে খুশি হয়ে মার প্রসাদ খেয়ে গেছেন। এখনও অর্ধেক প্রসাদ রয়েছে, তুমি উঠে দেখ।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, আশ্চর্য ব্যাপার! ব্রাহ্মণ ভাবলেন, এ শুধু মহামায়ারই লীলা। ব্রাহ্মণের দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

শেষদিন ব্রাহ্মণ পূজোয় বসে মাকে দইকড়মা নিবেদন করছেন। আজ মাকে বিদায় দিতে হবে। তাই ব্রাহ্মণের আজ যেন কিছুই ভাল লাগছে না। তিনি চোখ বুঁজে মার চিন্তা করছেন, এমন সময় সর্বমঙ্গলা ঠাকুরঘরে গিয়ে দেবীকে দেওয়া দইকড়মা খেতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ ব্রাহ্মণ চেয়ে বললেন, মা, তোমার এ কি কাণ্ড?

সর্বমঙ্গলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ব্রাহ্মণী আবার দইকড়মার আয়োজন করে দিলেন। এবারও সর্বমঙ্গলা গিয়ে সব খেয়ে ফেললে। ব্রাহ্মণী আবার আয়োজন করে দিলেন। এবারেও সর্বমঙ্গলা গিয়ে খেয়ে ফেললে। ব্রাহ্মণ মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, তোর আজ কি হয়েছে? তুই যা এখান থেকে।

ব্রাহ্মণী আবার দইকড়মা যোগাড় করছিলেন। সর্বমঙ্গলা গিয়ে বললে, মা, বাবা আমাকে আজ চলে যেতে বললেন। আমি তিনদিন ভাল করে খাই নি। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আর যেতেও হবে অনেকদূর, তাই আমি খেয়েছি বলে বাবা আমাকে চলে যেতে বললেন। মা, তবে আমি চল্লুম।

ব্রাহ্মণী পিছনে ফিরে আর মেয়েকে দেখতে পেলেন না। তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বামীকে সব কথা বললেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন, পাগলা মেয়ে, রাগ করে শেষকালে একাই বাড়ি চলে গেল বুঝি, পূজোর কাজ শেষ করে তিনি মেয়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ একেবারে মেয়ের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, মা, পূজোর সময় তুমি ব্যাঘাত করেছিলে বলে তোমাকে বকেছি। তাই বলে রাগ করে তুমি চলে এলে মা?

মেয়ে বললে, সে কি বাবা? আমি কখন তোমার বাড়ি গেলুম! আমি তো যাই নি।

ব্রাহ্মণ তখন বুঝতে পারলেন, দেবীই তাঁর মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলেন। দেবীর দয়ার কথা মনে করে ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। দুচোখে তাঁর জল, মুখে শুধু মা, মা।

কবিরাজ

মণ্টু ছোট ছেলে। বয়স তার দশ কি বার। কি যে তার অসুখ হয়েছে; যা খায়, কিছু হজম হয় না! যেখানে বসে, বসেই থাকে। তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মত ছুটোছুটি খেলাধূলা কিছুই তার ভাল লাগে না। শরীর দিন দিন শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

তার মা কত মানত করলেন, কত পূজো দিলেন। ওঝা রোজ এসে কত ঝাড়ফুঁক করলে, কত কবজ তাবিজ দিলে। কিছুতেই কিছু হল না। পাড়াপড়শিদের কেউ বললে, পরির ছোঁয়াচ লেগেছে। কেউ বললে, পেত্নীতে পেয়েছে। কেউ বললে, মুষ্টিযোগ চেষ্টা করে দেখ। আবার কেউ কেউ বললে, এসব কিছুতেই হবে না, ভাল একজন ডাক্তার বদ্যি দেখাও।

মণ্টুর গ্রামের চারপাশে তিন ক্রোশের মধ্যে কোন ডাক্তার কবিরাজ নেই। কি করা যায়? একদিন সকালে তার বাবা তাকে নিয়ে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হলেন। কবিরাজ বুড়ো মানুষ, কিন্তু খুব নাম করা কবিরাজ। কবিরাজ মণ্টুর অসুখের কথা সমস্ত শুনলেন, তারপর তাকে পরীক্ষা করে একটি ঔষধ দিলেন। আর বললেন, আর একদিন এস, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দেব।

মণ্টুর বাবা বললেন, কবরেজ মশায়, আমার বাড়ি এখান থেকে তিন ক্রোশ। আর এ ছেলেকে নিয়ে আসাও বড় কষ্টকর।

কবিরাজ উত্তর করলেন, তা হ'ক, আর একদিন নিয়ে এস।

দিন চার পাঁচ পর আবার একদিন মণ্টুর বাবা তাকে নিয়ে কবিরাজের বাড়ি গেলেন। কবিরাজ আবার তাকে একটু পরীক্ষা করলেন, তারপর খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিলেন, খুব সাবধানে খাওয়া দাওয়া করিস। 'গুড় খাওয়া ভাল নয়। গুড় একদম খাবি নি। একমাসের মধ্যেই অসুখ সেরে যাবে।

মণ্টু আর তার বাবা চলে গেলেন।

কবিরাজের একটি ছাত্র এ দুদিনই উপস্থিত ছিল। কবিরাজের কথা শুনে তার মনে এক প্রশ্ন হল। সে কবিরাজকে জিজ্ঞেস করলে, মশায়, খাওয়া দাওয়ার কথাটা কি আর প্রথম দিন বলতে পারতেন না? এ দুটি কথার জন্য মিছিমিছি এ রোগা ছেলেকে তিন তিন ছ ক্রোশ পথ হাঁটালেন।

কবিরাজ বললেন, না হে, এর মানে আছে। সেদিন আমার ঘরে অনেকগুলো গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি আমি তাকে গুড় খেতে নিষেধ করতুম, সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারত না; ভাবত কবিরাজের ঘরে এতগুলো গুড়ের নাগরি, নিশ্চয়ই কবিরাজ গুড় খায়, তাতে দোষ হয় না, আর আমি

খেলেই দোষ। পরদিনই সমস্ত নাগরি এ ঘর থেকে সরিয়েছি। এখন আমার কথা বিশ্বাস হবে।

কবিরাজের জ্ঞান দেখে ছাত্র অবাক হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলে, নিজে পালন না করলে শুধু মুখে উপদেশ দিলে তাতে কিছু ফল হয় না।

পদ্মলোচন

অনেক লোক আছে, যাদের ভিতরে কিছুমাত্র সারবস্তু নেই। কিন্তু তারা বাইরে খুব হাঁক ডাক করে। তাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হয়।

এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল। তার নাম পদ্মলোচন। গ্রামের লোক তাকে পোঁদো পোঁদো বলে ডাকত। সেই গ্রামে একটি পড়ো মন্দির ছিল, অনেকদিনের পুরনো। তাতে ঠাকুরবিগ্রহ নেই। কেউ মেরামত করে না। দেওয়ালে গাছ হয়েছে। উঠানে জঙ্গল হয়ে আছে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা গ্রামের লোক শুনতে পেলে, মন্দির থেকে শাঁকের শব্দ আসছে—ভোঁ ভোঁ। সকলে ভাবলে, বুঝি কেউ ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করেছে। তাই সন্ধ্যের সময় আরতি হচ্ছে। গ্রামের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সব আরতি দেখতে মন্দিরে ছুটল। গিয়ে দেখে, যেমন অপরিষ্কার ছিল, তেমনি সব পড়ে আছে। মন্দির মেরামত হয় নি, মার্জনা হয় নি। চারদিকে

আবর্জনা, জঙ্গল, চামচিকের বিষ্ঠা, এইসব। মন্দিরের ভিতর থেকে ভোঁ ভোঁ শাঁকের শব্দ আসছে। একজন চুপি চুপি দরজা ফাঁক করে দেখে, কোথাও ঠাকুরদেবতা নেই, কেবল পোঁদো এক কোণে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁক বাজাচ্ছে।

তখন সে চীৎকার করে বলতে লাগল—

মন্দিরে তোর নাইরে মাধব,
ওরে পোঁদো,
শাঁক ফুঁকে তায় করলি গোল।
চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে হানা।

মেছুনীর বিপদ

এক মেছুনী শহরে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিল। সেদিন হল ভয়ানক জল আর ঝড়। জল থামতে থামতে হয়ে গেল রাত! মেছুনী ভেবে সারা, কি করে বাড়ি ফিরবে। শেষকালে তার মনে হল, তার এক জানা লোক আছে শহরে। সে লোকটি ছিল এক বাগানের মালী।

মেছুনী ধীরে ধীরে সেই বাগানে উপস্থিত হয়ে মালীর কাছে নিজের অবস্থা সব জানালে। মালী বললে, তা আর কি হয়েছে? তোমাকে আমার ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি এখানে থাক, আমি বাবুদের কুঠির বারান্দায় থাকব'খন।

মালী মেছুনীকে কিছু খাবার এনে দিলে। মেছুনী তাই খেয়ে মালীর ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। মালী সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বাবুদের কুঠির দিকে চলে গেল।

মেছুনীর কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। খানিক এপাশ ওপাশ করলে, তবুও ঘুমের দেখা নেই। খানিকক্ষণ পাখা নিয়ে বাতাস করলে, তবুও না। তারপর দরজা খুলে একটু পায়চারি করবার জন্য বাইরে এল। আকাশে আর মেঘ নেই। ফুর ফুর করে দখিন হাওয়া বইছে। অগণিত তারার সাথে চাঁদ আকাশে হাসছে। বাগানের চারিদিকে কত রকম ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলের গন্ধে বাতাস যেন ভরপুর হয়ে আছে।

এতক্ষণ পরে মেছুনী বুঝতে পারলে, বাগানের ফুলের গন্ধেই তার ঘুম হচ্ছে না। পরে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে চিন্তে এক কাজ করলে। তার আঁশ চুপড়িতে কিছু জল ছিটিয়ে দিলে, তারপর চুপড়িটি মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়ল। তার শুধুই মনে হচ্ছিল, মালী ফুলের এ দুর্গন্ধের মধ্যে কি করে রোজ ঘুমোয়। আঁশ চুপড়ি নাকের কাছে, তাই ফুলের গন্ধ আর মেছুনীর নাকে লাগল না। দেখতে না দেখতে মেছুনী ঘুমিয়ে পড়ল।

সংসারে ভাল জিনিস সকলের কাছে ভাল লাগে না। কারু কারু মন্দ জিনিষই ভাল মনে হয়।

উল্‌টা সমৃঝিলি রাম

এক সাধু তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন সব তীর্থ ঘুরে ঘুরে সাধু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একে সাধুর বয়স হয়েছে, তার উপর সঙ্গের লোটা কম্বল এ-সবের বোঝাও কম নয়।

তখন সাধুর মনে হল, যদি তিনি একটি ছোট্ট ঘোড়া পেতেন তবে বেশ হত। মালপত্রও ঘোড়ার উপর দিতেন, নিজেও চড়ে যেতে পারতেন। সাধু তখন রামের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, একটু টাট্টু দেলায় দে রাম, একটু টাট্টু দেলায় দে রাম।—হে রাম, আমায় একটা ঘোড়া দাও। হে রাম, আমায় একটা ঘোড়া দাও।

সাধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর এই বলে প্রার্থনা করছেন।

সে অনেক দিনের কথা। তখন এদেশে রেলগাড়ী আসে নি। ইংরাজ আসে নি। মুসলমান বাদশারা এদেশের রাজা। সাধু যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে পথে একদল সেপাই যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে। যেতে যেতে পথে একটি ঘোড়ীর বাচ্চা হয়ে গেল। কি করা যায়? সেপাইদের আবার সেখানে থামবারও উপাই নেই। ছোট বাচ্চা তো আর এতদূর হেঁটে যেতে পারে না। তখন তারা একটা লোক খুঁজতে লাগল, যে বাচ্চাটাকে সেপাইদের পিছু পিছু বয়ে নিয়ে যাবে।

উল্টা সমঝিলি রাম

খুঁজতে খুঁজতে সেপাইরা দেখলে, পথে একটা লোক একটু টাট্টু দেলায় দে রাম—এই বলে চীৎকার করে যাচ্ছে। সেপাইরা তাকে ধরে আনলে, আর জোর করে তার কোলে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে চাপিয়ে দিয়ে বললে, চল আমাদের সঙ্গে।

সেপাইরা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের পিছনে সাধুটি নিজের মালপত্রের উপর ঘোড়ার বাচ্চাকে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন। চলতে দেরি হলে সেপাইরা তাড়া দিচ্ছে। যেতে যেতে সাধুর ভারি দুঃখ হল, তখন কেঁদে কেঁদে বলছেন, উল্‌টা সম্‌ঝিলি রাম, উল্‌টা সম্‌ঝিলি রাম।—রাম, আমার কথা উল্‌টা করে বুঝলে।

ভূতুড়ে জগাই

জগাই ছিল বড় গরীব। আবার বড় লোক হবার ইচ্ছেও ছিল তার মনে খুব। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে খাটত। কিন্তু সংসারের অবস্থা তার দিন দিনই খারাপ হতে লাগল। আবার অবস্থা যত খারাপ হতে লাগল, ধনী হবার ইচ্ছেও তার মনে তত বেড়েই চলল।

কোথাও কোন সাধু সন্ন্যাসীর খবর পেলে জগাই সংসারের সব কাজ ফেলে তাঁদের কাছে দৌড়ে যায়। তার বিশ্বাস, সাধু সন্ন্যাসীরা ধন পাবার উপায় বলে দিতে পারেন। অনেকদিন পর জগাই শুনলে, একজন মস্ত বড় সাধু শিবমন্দিরে এসেছেন।

জগাই গিয়ে রাতদিন সাধুর কাছে পড়ে রইল, আর এক মনে তাঁর সেবা করতে লাগল।

জগাইর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন সাধু তাকে বললেন, জগাই, তুই কি চাস ?

জগাই সাধুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, ঠাকুর, আমি বড় গরীব। আমি ধন চাই।

সাধু হেসে বললেন, ওরে পাগলা, সাধু সন্ন্যাসীরা যে ভিকিরি। তাঁদের কাছে ধন চাইলে কি হবে? তুই আর কিছু চা।

জগাই কোন কথা শুনলে না, কেঁদে কেঁদে বললে, ঠাকুর, আমি ধন চাই, আর কিছু চাই নে। আমার একটা উপায় করে দিতেই হবে।

জগাইর দুঃখ দেখে সাধুর মনে দয়া হল। তিনি বললেন, এক কাজ কর। ভূত সাধন কর। তাতে একটা ভূত তোর চাকর হয়ে থাকবে। তাকে যা আদেশ করবি, সে তাই করে দেবে। যা এনে দিতে বলবি, সে তাই এনে দেবে। এই মন্ত্র নে। বনে গিয়ে এটি জপ কর। তারপর ভূত আসবে। একটুও ভয় করিস নে। তোর কোন অনিষ্ট সে করবে না।

জগাইর মনে আনন্দ আর ধরে না। তখনই সে বনে গিয়ে একমনে ভূতের মন্ত্র জপ করতে লাগল। একটু জপ করতে না করতেই এক বিরাট ভূত সামনে এসে হাজির। ভূতের চেহারা দেখে জগাই ভয়ে একেবারে অজ্ঞান হবার মত। শেষকালে

মনে সাহস এনে সে সোজা হয়ে বসল। ভূত বললে, কেন আমায় ডাকলে ?

জগাই— আজ থেকে তুই আমার চাকর হবি। আমি যা বলব, তাই করতে হবে। যা বলব যদি না করতে পারিস, তাহলে আমি তোকে মেরে ফেলব।

ভূত—তোমার কথায় রাজি হতে পারি, তবে আমারও একটা কথা আছে।

জগাই— কি কথা ?

ভূত—আমি তোমার আদেশ যদি পালন করতে না পারি, তবে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। আবার তুমি আমাকে কখনও অবসর বসিয়ে রাখতে পারবে না। যখনই আমাকে কাজ দিতে পারবে না, তখনই আমি তোমার ঘাড় মটকে দেব।

জগাই ভাবলে, বাঃ রে, চাকরগুলো কাজকর্ম না করতে পেলেই বাঁচে। আর এ বলছে, সর্বদা কাজ দিতে হবে। কাজ না পেলে আমার ঘাড় মটকাবে। আচ্ছা বাছাধন, দেখি কত কাজ করতে পার !

সে ভূতকে বললে, আমি তোর কথায় রাজি আছি।

ভূত বললে, তবে বল, আমায় কি করতে হবে।

জগাইর ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। এ কদিন সাধুর ওখানে তেমন ভাল খাবার জোটে নি। তাই প্রথমেই বললে, যা, শিগগির আমার জন্যে খুব ভাল ভাল খাবার নিয়ে আয়। আর এক গেলাস ঠাণ্ডা শরবৎ নিয়ে আয়, দেখিস যেন দেরি না হয়।

যে আজ্ঞে বলে ভূত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পর দু তিন মিনিটের মধ্যেই একথালা খুব ভাল খাবার, কত রকমের ফল, আঙুর বেদানা আনারস কমলা আম এই সব, আর এক গেলাস ঠাণ্ডা সুগন্ধি মিষ্টি শরবৎ নিয়ে উপস্থিত। জগাই তো অবাক।

এগুলো জগাইর সামনে রেখেই ভূত আবার জিজ্ঞেস করলে, এবার কি করব ?

জগাই বললে, রাখ বাবা, খেয়ে দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই। তারপর কাজের কথা হবে।

মাথা নেড়ে ভূত বললে, আমার এক কথা। কাজ না দিতে পার মাথা দাও।

মহা বিপদ। জগাই নেহাত বোকা ছিল না। তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা বেশ, একখানা পাখা নিয়ে আয় আর আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে হাওয়া কর।

ভূত হাওয়া করতে আরম্ভ করলে। জগাইও প্রাণভয়ে আহার করতে লাগল। অনেক সব খাবার, খাওয়া দূরে থাক জন্মেও সে চোখে দেখে নি। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ হল।

ভূত সামনে দাঁড়িয়ে। জগাই বললে, ঐ যে দূরে পাহাড়টা দেখছিস, তার উপর একটা বিরাট নগর তৈরি কর।

ভূত কাজে লেগে গেল। দেখতে না দেখতে অল্প সময়ের মধ্যেই অত বড় পাহাড় একটি সুন্দর নগরে পরিণত হয়ে গেল।

জগাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। ভূত আবার সামনে এসে উপস্থিত। আবার নূতন কাজ দিতে হবে।

জগাই বললে, দেখ, নগরের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত রাজবাড়ি তৈরি কর। বাগান রাস্তা ঘাট সব সুন্দর করিস্, আর ভাণ্ডারে অজস্র মনি মুক্তো হীরে জহরত সোনা রুপো সব রাখিস।

ভূত চলে গেল। আবার একটু পরে এসে জানালে, সব হয়ে গেছে।

জগাইর ভারি ইচ্ছে একবার গিয়ে সব দেখে, বিশেষ করে ধনভাণ্ডারটা। সে বললে, আমাকে আকাশপথে রাজ-বাড়িতে ঠিক ধনভাণ্ডারের সামনে নিয়ে যা।

জগাই ভূতের কাঁধে চড়ে বসল। তার গা রি রি করতে লাগল। ভয়ে সে চোখ বুঁজলে। অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ-বাড়িতে একেবারে ধনভাণ্ডারের সামনে এসে উপস্থিত! এত ধনরত্ন দেখে জগাই যে কি করবে, ভেবে উঠতে পারলে না। কিন্তু হতভাগা ভূতটার জ্বালায় একটু সুস্থির হয়ে দেখবার কি আর জো আছে? কেবল কাজ দাও, কাজ দাও।

জগাই বললে, একটি সিংহাসন তৈরী কর, আর আমাকে রাজার পোষাক এনে দে। আমার পুরনো কাপড়-চোপড়গুলো যা নদীতে ফেলে দিয়ে আয়।

ভূত সব করে এল। জগাই বললে, আমার স্ত্রী পুত্র সকলকে এখানে নিয়ে আয়। আর দেখ বাবা ভূতের পো,

তোর চেহারাখানা একটু মোলায়েম করে যা যেন আমার ছেলেপিলেগুলো ভয় না পায়। আর তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সব রাজবাড়ির মত করে নিয়ে আয়।

যেই আদেশ সেই কাজ। অল্প সময়ের মধ্যেই সব এসে হাজির। তাদের দেখে জগাইর মনে কত আনন্দ। এদিকে ভূতের কাণ্ড দেখে সে একটু চিন্তিতও হতে আরম্ভ করেছে। যা আদেশ করবে, লক্ষ্মীছাড়া কথা শেষ হবার আগেই কাজ শেষ করে আসে! নতুন আর কি কাজ দেওয়া যেতে পারে?

ভূতের চোখে আগুন জ্বলছে। কাজ দিতেই হবে। জগাই বললে, দেখ বাবা ভূত, এতবড় রাজবাড়ি রাজপাট। লোকজন না হলে কি ভাল লাগে? আমি হলুম রাজা। আমার মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্ত সব নিয়ে আয়। রাজ্যে দোকানপাট সব বসা, তবে তো?

সব হয়ে গেল। পাত্র মিত্র মন্ত্রী সেনাপতি সব দরবারে এসে হাজির। রাণী তাদের দেখে অন্দরমহলে চলে গেলেন। সেপাইরা বাইরে কুচকাওয়াজ করছে। দ্বারে দ্বারে প্রহরী দাঁড়িয়ে। ফটকে রশনচৌকি বাজছে। বন্দীরা রাজসভায় গান গাইছে। মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলে সমাদর করে জগাইকে রাজসিংহাসনে বসালে। জগাই এখন রাজা। রাজা হয়েও জগাইর মনে সুখ নেই। ভূতটা বুঝি শেষকালে ঘাড়ই মটকায়।

সিংহাসনের সামনে ভীষণ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে। হাত দুটো যেন নিসপিস করছে।

তবু রক্ষে, রাজা ছাড়া আর কেউ ভূতকে দেখতে পাচ্ছে না। ভূত বললে, জগাই, এবার।

জগাইরাজা মনে মনে রামনাম জপছে, গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে, তবু কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। ভূত ঘাড়ে ধরে আর কি। তখন জগাইরাজা বললে, ভূত, আমাকে আমার গুরু-দেবের কাছে নিয়ে যা।

ভূত তাকে গুরুর কাছে নিয়ে গেল। ভূতের হাতে মুকুট দিয়ে জগাই বললে, যা, ঐ নদীর ধারে বসে আমার মুকুট পাহারা দে, যত সময় আমি ওখানে ফিরে না যাই।

সাধু জগাইকে দেখে সবই বুঝতে পারলেন। গুরুদেবকে দেখে জগাই তাঁর পা-ছুটি জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল, গুরুদেব আমি মরলুম, আমি মরলুম।

গুরুদেব বললেন, সে কি কথা বাছা? এখনই মরবে কি? তোমার রাজ্য-রাজত্ব ভোগ করবে কে? আমি সব বুঝতে পেরেছি। যাও এক কাজ কর, ঐ যে কুকুরটা শুয়ে আছে, তোমার তরবারি দিয়ে তার লেজটা কেটে নিয়ে এস। তারপর তোমার ভূতকে দাও, এইটি সোজা করে দিক।

জগাইরাজা সাধুকে প্রণাম করে কুকুরের লেজ কেটে আনলে। ভূতের কাছে উপস্থিত হতেই ভূত বললে, কাজ দাও।

জগাইরাজা আনন্দে উত্তর করলে, এই যে দিচ্ছি। আমাকে আমার রাজবাড়িতে নিয়ে যা।

ভূত তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেল।

ভূত বললে, এখন কি করব বল।

এবার গুরুর কৃপায় জগাইর মনে আনন্দ এসেছে। সে বললে, এই ত দিচ্ছি। নে এই কুকুরের লেজটি। এইটি বাঁকা হয়ে আছে। লেজটি সোজা করে দে তো বাবা। আর দেখ, খুব সাবধানে করিস। এটি আমার বড় দরকারী জিনিস।

ভূত কুকুরের লেজকে কিছুতেই সোজা করতে পারলে না। যত সময় ধরে রাখে, তত সময় সোজা, আবার ছাড়লেই যেমন বাঁকা তেমনি বাঁকা। শেষকালে ভূত জগাইরাজার কাছে উপস্থিত হয়ে যোড়হাতে বললে, বাবা, এবার আমাকে ছুটি দাও। তোমার কাজ আমার দ্বারা আর হবে না।

জগাইরাজাও তাই চায়। সে ভূতকে আনন্দে বিদায় দিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

সাধুসঙ্গ

এক চোর রাজার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল। রাজা রাণী তখন গল্প করছেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোর সব কথা শুনলে। রাণী রাজাকে বলছেন, তুমি রাতদিন তোমার রাজকার্য নিয়েই আছ, এদিকে মেয়েটির পানে একবারও তাকাচ্ছ না।

রাজা—কেন, মেয়ের তোমার কি হল আবার?

রাণী—কি আর হবে গো? মেয়ে তো দিন দিন বেড়ে

চলল। তাকে তো আর চিরদিন তোমার ঘরে রাখতে পারবে না। এই বেলা মেয়ের বিয়ের জন্য একটু চেষ্টা কর।

রাজা—কি আর করব বল। যতগুলো সম্বন্ধ এসেছে, তোমার তো একটিও মনোমত হয় না। তা এক কাজ করা যায়।

রাণী—কি?

রাজা—মেয়ে তোমার বড় ধর্মপরায়ণা। দিনরাত ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছে। গঙ্গাতীরে অনেক সাধু এসেছেন। তাঁদের একজনকে এনে মেয়ের বিয়ে দেব, কি বল?

রাণী—বেশ, আমার তো ঐ একটিমাত্র সন্তান। আমাদের পর মেয়ে-জামাইই আমাদের রাজ্যের অধিকারী হবে। তা মন্দ বল নি। কাল সকালেই যাও।

রাজা—হাঁ, কাল সকালেই এর ব্যবস্থা করব।

এদিকে চোর রাজা-রাণীর কথা শুনে মনে মনে ভাবলে, রাজার জামাই হবার সুযোগটা ছাড়ি কেন! এই ভেবে চোর গঙ্গা-তীরে গিয়ে অন্যান্য সাধুদের একপাশে সাধু সেজে বসে রইল। পরদিন সকালে রাজার লোক সাধুদের কাছে গিয়ে উপস্থিত। তারা রাজার ইচ্ছার কথা প্রত্যেক সাধুর কাছে গিয়ে বলতে লাগল, আর রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু বিয়ের কথায় সাধুদের কেউ রাজী হলেন না। শেষকালে রাজার লোকেরা সাধুবেশধারী সেই চোরের কাছে গিয়ে বিয়ের কথা বললে। চোর হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না, চুপ করে রইল।

রাজার লোক ফিরে গিয়ে রাজার কাছে বললে, মহারাজ, কোন সাধুকেই আমরা রাজী করাতে পারলুম না। কেবল একজন যুবা সাধু চুপ করে রইলেন। আপনি নিজে গিয়ে অনুরোধ করলে হয়তো তিনি রাজী হতেও পারেন।

লোকজন সঙ্গে করে রাজা গঙ্গাতীরে চোর-সাধুর কাছে উপস্থিত হলেন। রাজাকে নিজে আসতে দেখে চোরের মনে কি রকম এক ভাব হল। রাজা চোরকে মাটিতে পড়ে প্রণাম করলেন ও তাঁর মেয়েকে গ্রহণ করবার জন্য কত করে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। আর বললেন, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজ্য দেবেন এবং রাজার মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যই তাঁর হবে।

চোর তখন মনে মনে ভাবছে, আমি চোর, স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসে সাধু সেজে বসেছি। যদি সত্যিকার সাধু হতে পারি তবে কি-না পেতে পারি। এতেই দেশের রাজা এসে পায়ে লুটাচ্ছে, মেয়ে আর রাজ্য নিয়ে সাধাসাধি করছে। না, আমি আজ থেকে সত্যিকার সাধু হবার চেষ্টা করব।

রাজা অনেক অনুনয় করেও তাঁকে রাজী করাতে পারলেন না। চোর বিয়ে করলে না। সে সাধুদের সঙ্গে চলে গেল।

রামের ইচ্ছে

এক তাঁতি ছিল রামের খুব ভক্ত। সে মনে করত, সংসারে যা কিছু সবই রামের ইচ্ছায় হয়। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ সবই রামের ইচ্ছায় হচ্ছে। তাই সে তার প্রতি কথায় বলত, রামের ইচ্ছে।

হাটে গিয়ে সে কাপড় বিক্রি করত। খদ্দের এসে জিজ্ঞেস করলে, এ কাপড়খানার দাম কত? তাঁতি উত্তর করত, রামের ইচ্ছেয় সুতোর দাম এক টাকা, রঙের দাম এক আনা, রামের ইচ্ছেয় মজুরি চার আনা, রামের ইচ্ছেয় লাভ দু আনা, রামের ইচ্ছেয় কাপড়খানার দাম এক টাকা সাত আনা।

তাঁতির ভাব দেখে সকলেই তাকে ভক্তি করত। দর কষাকষি না করে সকলেই তার কাছ থেকে কাপড় কিনত।

একদিন অনেক রাত্রে তাঁতি হাট থেকে ফিরে এসেছে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে আর রামের চিন্তা করছে। এমন সময় কতকগুলো ডাকাত সেই গ্রামে ডাকাতি করে তাঁতির বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ডাকাতদের একজনের মাথায় বোঝা ভারী হওয়ায় সে আর চলতে পারছিল না। তখন সকলে মিলে তাঁতিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল আর তার মাথায় খানিকটা বোঝা চাপিয়ে দিলে।

তাঁতি আর কি করে। সবই রামের ইচ্ছে। সেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। এদিকে পুলিসের লোক কিভাবে খবর পেয়ে ডাকাতদের পিছনে তাড়া করলে। পুলিস আসছে বুঝতে পেরে ডাকাতরা মালপত্র ফেলে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল। তাঁতি বুড়ো মানুষ, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিসের লোকেরা তাঁতিকে ধরে নিয়ে গেল। তাঁতি ভাবছে, রামের ইচ্ছে।

পুলিস তাঁতিকে ডাকাত বলে চালান দিলে। হাকিমের কাছে বিচার। এত বড় ধার্মিক লোক ডাকাতি করেছে। সেদিন বিচার দেখতে বিচারালয়ে লোকের মহা ভিড়। হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ডাকাতি করেছ?

তাঁতি—না ধর্মাবতার, রামের ইচ্ছেয় আমি ডাকাতি করি নি।

হাকিম— তুমি ডাকাতি কর নি? তবে ডাকাতির মালপত্রসহ পুলিসের লোক তোমাকে ধরলে কি করে?

তাঁতি—হুজুর, হাট থেকে ফিরতে রামের ইচ্ছেয় সেদিন অনেক রাত্রি হয়েছিল। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে দাওয়ায় বসে রামের ইচ্ছেয় তামাক খাচ্ছি। তখন ডাকাতরা রামের ইচ্ছেয় আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার মাথায় তাদের খানিকটা বোঝা চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর রামের ইচ্ছেয় পুলিসের লোকেরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন রামের ইচ্ছেয় মালপত্র ফেলে ডাকাতেরা সব পালিয়ে যায়। তারপর

রামের ইচ্ছেয় পুলিস আমাকে ধরে আপনার কাছে হাজির করেছে।

আদালতে বহু বড় বড় উকিল উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁতিকে জানতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা হাকিমকে বুঝিয়ে দিলেন, এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। সকলেই তাকে জানে। তার সাধুতার জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। হাকিম তাঁতিকে খালাস করে দিলেন।

তাঁতি বাড়ি ফিরে এল। তাকে ফিরে আসতে দেখে সকলেই আনন্দ করতে লাগল। তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেয় ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেয় ছেড়ে দিলে।

ব্রাহ্মণের গো-হত্যা

এক ব্রাহ্মণের বাগানের বড় সখ ছিল। তিনি অনেক টাকা খরচ ও অনেক পরিশ্রম করে একটি অতি সুন্দর বাগান করেছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজেই বাগানের কাজ করতেন। একদিন বাগানের ফটক খোলা ছিল। একটা গরু তখন বাগানে প্রবেশ করে কতকগুলো ভাল ভাল গাছ খেতে আরম্ভ করলে।

ব্রাহ্মণ দূরে কাজ করছিলেন। গরু গাছ খাচ্ছে দেখে লাঠি নিয়ে দৌড়ে এলেন। বহু যত্নের গাছ এভাবে গরুর পেটে যাচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণের ভয়ানক রাগ হল। রাগের মাথায় লাঠি

দিয়ে গরুকে মারতে লাগলেন। তাড়া খেয়ে গরুও পালাচ্ছিল। কিন্তু লাঠির একটা ঘা এমনভাবে লাগল যে, গরুটি তা সহ্য করতে না পেরে সেখানে পড়ে ছটফট করে মরে গেল।

ব্রাহ্মণের তখন মাথা ঠাণ্ডা হল। গরুটি মরে গেল দেখে ব্রাহ্মণ ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গোহত্যা যে মহাপাপ! যদি কেউ দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি গরুটিকে টেনে বাগানের ধারে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলেন।

ব্রাহ্মণের কাণ্ড অন্য লোক কেউ দেখতে পেল না বটে কিন্তু তাঁর নিজের মনে ভারি চিন্তা হল। গোহত্যা যে মহাপাপ! মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ করে ফেলে বা করতে যায়, তখন মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায়,—মনে একটা বিচার আসে। বিচার নানাভাবে বুঝিয়ে দেয়—সে কাজটি অন্যায় নয়। মানুষ এই মিথ্যা বিচারে মনকে প্রবোধ দেয় আর নিশ্চিন্ত হয়।

ব্রাহ্মণের মনেও এরূপ একটা বিচার এল। ব্রাহ্মণ ছেলে বয়সে একটু শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তাতে পড়েছিলেন, মানুষের হাত পা চোখ কান, এসব এক এক দেবতার শক্তিতে কাজ করে। হাতের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে।

ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, গোহত্যা হয়েছে। আমার হাত গরুকে লাঠি মেরেছে। আবার ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে। সুতরাং গোহত্যার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রই তো দায়ী। পাপ তাঁরই, আমার কি?

এই ভেবে ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানের কাজে মন দিলেন। সুকাজ কুকাজ, কাজ করলে তার ফল আছেই। কুকর্মের ফল পাপ, একজনকে ভোগ করতেই হয়। গোহত্যা-পাপ যখন ব্রাহ্মণের কাছে এসে উপস্থিত হল, ব্রাহ্মণ তাকে আমল দিলেন না। ব্রাহ্মণ বললেন, আমার কাছে কেন বাপু? গোহত্যা কি আমি করেছি? আমার হাত ইন্দ্রের শক্তিতে গরু মেরেছে। গোহত্যার জন্য ইন্দ্র দায়ী, তাঁর কাছে যাও।

পাপ আর কি করে, ইন্দ্রের কাছে গিয়ে হাজির হল। হঠাৎ পাপকে দেখে ইন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন পাপ সমস্ত ঘটনা ইন্দ্রের কাছে বললে। সব শুনে ইন্দ্র বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও বাপু, আমি বামুনের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে আসি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে ইন্দ্র বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক অল্প দূরে বাগানের কাজ করছিলেন। ইন্দ্র যেন তাঁকে দেখতে পান নি। তিনি বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আঃ কি সুন্দর বাগান! যেমন চমৎকার রুচি, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ। কে এই বাগানের মালিক? এ চমৎকার বাগান কে করেছে? যেদিকে চাই, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

ইন্দ্র কথাগুলো এমনভাবে বলছেন, যেন ব্রাহ্মণ শুনতে পান।

ব্রাহ্মণ দেখলেন, একজন বৃদ্ধ বাগানে এসেছেন আর শতমুখে বাগানের প্রশংসা করছেন। প্রশংসা শুনে ব্রাহ্মণের আনন্দ

ধরে না। তাড়াতাড়ি তিনি বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণকে সামনে দেখে ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কি চমৎকার বাগান! বলতে পার, বাবা, এ বাগানটি কার?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে, এটি আমারই।

বৃদ্ধ—বটে, তোমার? আহা, ধন্য তোমার বাগান আর ধন্য তুমি! কি বাগানের পারিপাট্য, কি যত্ন, কি সৌন্দর্যজ্ঞান! তুমিই কি এসব করেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে হাঁ, সবই আমি করেছি। এই যা দেখছেন সবই আমার নিজ হাতে করা।

বৃদ্ধ—বেশ বাবা, বেশ। চল, তোমার বাগানটি একটু বেড়িয়ে দেখি।

ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে বৃদ্ধকে একে একে সব দেখাতে লাগলেন, আর গল্প করে করে ছুজনে বাগানে বেড়াতে লাগলেন। একটি সুন্দর গাছ দেখে ইন্দ্র বললেন, বাঃ, এ গাছ তুমি কোথা পেলে? এটি ভারি দামী গাছ। এদেশে পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে এটি সংগ্রহ করেছি মিথিলা থেকে। তা সহজে কি বাঁচতে চায়? একে বাঁচাবার জন্য কি পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে! ঐ যে লতাটি দেখছেন, ওটি এনেছি গান্ধার থেকে।

বৃদ্ধ—সব কাজই তুমি কর বাবা?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে হাঁ, আমিই নিজ হাতে সব করি। চাকর-বাকর দিয়ে এসব কাজ হয় না।

ইন্দ্র বললেন, বাগান করেছ তুমি, গরুও মেরেছ তুমি

বৃদ্ধ—তুমিই সব গাছ নিজ হাতে লাগিয়েছ ?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে হাঁ, আমিই লাগিয়েছি।

বৃদ্ধ—তুমিই গাছের যত্ন কর ?

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে, আমিই সার দিই, যত্ন করি।

এভাবে গল্প করতে করতে ও বাগান দেখতে দেখতে তাঁরা বাগানের এক সীমায় এসে উপস্থিত হলেন। কাছেই মরা গরুটা পড়ে আছে। যেন হঠাৎ সেটি চোখে পড়েছে, বৃদ্ধ চমকে উঠে বললেন, আঃ, গরু মারলে কে ?

ব্রাহ্মণ—এতক্ষণ সবই আমি করেছি, আমি করেছি বলছিলেন, এখন তাই আর বলতে পারলেন না, এ গরু আমি মারি নি, ইন্দ্র মেরেছেন। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ব্রাহ্মণ চুপ করে রইলেন। তখন ইন্দ্র নিজের রূপ ধরে বললেন, বাপু, আমার নাম ইন্দ্র, যত কিছু ভাল, যত কিছু প্রশংসার, সে সব করবার সময় তুমি, আর গরু মারবার বেলায় ইন্দ্র ! সে কি হয় ? যিনি বাগান করেছেন, তিনিই গরু মেরেছেন। তোমার পাপ তুমি নাও। আমি চললুম।

অবধূত

একজন বড় সাধু ছিলেন। লোকে তাঁকে অবধূত বলে ডাকত। অবধূতের গুরু ছিলেন অনেক এবং গুরুদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবার নিয়মও ছিল তাঁর অদ্ভুত।

একদিন পথে যেতে যেতে অবধূত দেখতে পেলেন, ঢাক ঢোল বাজিয়ে খুব জাঁকজমক করে একটি বর আসছে, আর এদিকে এক শিকারী হাতে তীর-ধনু নিয়ে একটি পাখির দিকে লক্ষ্য করছে। পাখিটি গাছের উপর বসে ছিল। এত জাঁক করে এত ঢাক ঢোল বাজিয়ে বর যাচ্ছে, শিকারী সেদিকে একবার চেয়েও দেখছে না।

অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বললেন, তুমি আমার গুরু। যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বসব, তখন যেন তাঁর প্রতি আমার এরূপ লক্ষ্য থাকে।

আর একদিন অবধূত দেখতে পেলেন, একটা লোক পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। ফাতনায় মাছ খাচ্ছে। তখন একজন পথিক এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, মশায়, রামগঞ্জের হাটে যাব কোন পথে?

লোকটি পথিকের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে একমনে ফাতনার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাছ গেঁথে তখন পিছন ফিরে বললে, আপনি কি বলছিলেন?

তারপর পথিকের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

এই দেখে অবধূত তাকে প্রণাম করে বললেন, আপনি আমার গুরু। আমি যখন ভগবানের ধ্যানে বসব, তখন কাজ শেষ না করে যেন অন্যদিকে মন না দিই।

একদিন একটা চিল এক টুকরো মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে শত শত কাক চিল তার পিছনে লাগল। তারা তাকে ঠুকরে কামড়ে বিরক্ত করে মাছটুকরো কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। সে যেখানে যায়, কাক-চিলগুলো সব তার পিছনে পিছনে চেঁচাতে চেঁচাতে সেখানে যায়। শেষকালে মহাবিরক্ত হয়ে মাছটা সে দিলে ফেলে। অমনি আর একটা চিল ছোঁ মেরে মাছ টুকরো নিয়ে পালিয়ে গেল। আর যায় কোথায়? সব কাক-চিলগুলো প্রথম চিলকে ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে চলে গেল। প্রথম চিলটা তখন এক গাছের ডালে চুপ করে বসে রইল।

অবধূত চিলকে নমস্কার করে বললেন, তুমি আমার গুরু। তোমার কাছ থেকে শিখলুম, এ সংসারে উপাধি বড় ভয়ানক জিনিস। উপাধি ফেলে দিতে পারলেই শান্তি, নইলে মহা বিপদ।

একদিন অবধূত দেখলেন, একটা বক পুকুরধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে একটা মাছ লক্ষ্য করছে। মাছটা কাছে এলেই খপ করে ধরবে। এদিকে একটা ব্যাধ বকটিকে লক্ষ্য করছে। বক কিন্তু মাছের দিকে এমনভাবে একমনে চেয়ে আছে, সে ব্যাধের ব্যাপার কিছুই দেখতে পায় নি।

অবধূত বককে নমস্কার করে বললেন, বাবা, তুমি আমার গুরু। আমি যখন ধ্যানে বসব, আমিও তোমারই মত যেন একমনে ধ্যান করতে পারি।

অবধূতের আর এক গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি অনেক দিন ধরে কত কষ্টে মধু সঞ্চয় করে। কোথা থেকে একজন মানুষ এসে চাক ভেঙে মধু নিয়ে চলে যায়। অনেক কষ্টের সঞ্চিত ধন মৌমাছি ভোগ করতে পারে না। তাই দেখে অবধূত বললেন, মৌমাছি আমার গুরু। সঞ্চয় করলে পরিণাম যে কি হয়, মৌমাছির কাছ থেকে আমি শিখলুম।

ফোঁস ফোঁস

মস্ত বড় এক মাঠ। তার মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। চার পাশে তার গ্রাম, কত লোকের বাস। রোজ সকালে গ্রামের রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে মাঠে আসে চরাতে। তারা গাছের ছায়ায় বসে মুড়ি খায়, খেলা করে, বাঁশি বাজায়, আর গরুগুলো চারদিকে চরে বেড়ায়।

সেই মাঠের মাঝখানে থাকত একটা ভয়ানক সাপ। গরু বাছুর মানুষ যেই তার গর্তের কাছে যেত, সাপটা তেড়ে এসে তাকে কামড়ে দিত। বাবা গো! যেমন তার গায়ের রং তেমনি তার ফণা আর তেমনি তার বিষ! যাকে ছোবল মারত, একটা চীৎকার করে সেখানেই সে পড়ে মরে যেত। সাপের ভয়ে কেউ সে পাশে যেত না।

একদিন এক সাধু সে পথে যাচ্ছিলেন। মাঠের সব রাখাল বালক তাঁকে বললে চীৎকার করে, বাবাঠাকুর, ওপথে যেও না। ওখানে একটা ভয়ানক সাপ আছে। ওদিকে যে যাবে, তাকে সে কামড়াবেই। এমনি তার বিষ, কামড় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। ওপথে যেও না।

সাধু বললেন, আমি সাপের মন্তর জানি। আমাকে কামড়াতে পারবে না।

এই বলে সাধু সেই পথ দিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। বালকেরা সব দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল, কি হয়।

সাধু যাচ্ছেন। গর্তের কাছে যেতে না যেতেই সাপটি তেড়ে এসে ফোঁস করে ফণা ধরলে। সাধু অমনি একটা মন্ত্র বললেন। মন্ত্রের কি গুণ! সাপটা একেবারে কেঁচোর মত হয়ে গেল। সাপের অবস্থা দেখে সাধুর মনে দয়া হল। তিনি তাকে নানা ধর্মকথা বোঝাতে লাগলেন, দেখ্, এতদিন ধরে তুই কত প্রাণীকে হত্যা করেছিস। তোর মহাপাপ হয়েছে। মরবার পর কি হবে, কখনও ভেবে দেখেছিস? তুই আমার কাছে মন্ত্র নে।

সাধুর কথায় সাপের চৈতন্য হল। সে যে কত পাপ করেছে, সত্যিই সে বুঝতে পারলে। সে সাধুর শিষ্য হল। সাধু তাকে মন্ত্র দিয়ে বললেন, এইটি রোজ জপ করবি, আর কখনও কোন প্রাণীকে হিংসা করিস নি।

এই বলে সাধু চলে গেলেন।

খুব ভক্তি করে সাপ গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করতে লাগল। সেদিন থেকে আর কাউকে তাড়া করে না, কামড়ায় না। কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখলে সাপটা ফণা ধরে আর তেড়ে আসে না, গরু বাছুর কাছে গেলেও কিছু বলে না। তখন তারা দূর থেকে তার গায়ে ঢিল মারতে লাগল। সাপ তাদের দিকে ফিরেও চায় না। রাখালেরা বুঝতে পারলে, এসব সাধুর মন্ত্রেরই গুণ। ধীরে ধীরে তাদের সাহস বাড়তে লাগল। একদিন তারা কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে এমন মার মারলে, সাপটা একেবারে মরার মত হয়ে পড়ে রইল। সকলে ভাবলে মরে গেছে।

একটা দুষ্ট ছেলে লেজে ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে।

সাপটা মরে নি। মার খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এল। তারপর ধীরে ধীরে অতিকষ্টে গর্তে গিয়ে পড়ে রইল। কিছুদিন গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারত না। তারপর ধীরে ধীরে সেরে উঠল। রাখালদের ভয়ে দিনে সে গর্তের বাহিরে আসত না। খাবার খোঁজে রাত্রে বাইরে আসত।

সাপকে আর কেউ দেখতে পায় না। সকলে মনে করলে মরে গেছে। অনেকদিন পর সেই সাধু আবার সেপথে যাচ্ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে রাখাল বালকেরা খুব ভক্তি করে তাঁকে প্রণাম্ করলে আর বললে, বাবাঠাকুর, সে সাপটা মরে গেছে। ও কথা সাধুর বিশ্বাস হল না। তিনি জানতেন মন্ত্রের সাধন না হলে সাপ মরবে না। তিনি সাপের গর্তের কাছে গিয়ে তাকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন।

গুরুর ডাক শুনে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলে। কতদিন পর গুরুকে দেখতে পেয়ে সাপের মনে আজ কত আনন্দ! গুরু জিজ্ঞেস করলেন, হাঁরে, কেমন আছিস?

সাপ—আজ্ঞে, আপনার কৃপায় পরম সুখে আমার দিন কাটছে।

গুরু—তা এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

গুরুর উপদেশ ও সাধনার গুণে সাপের মন থেকে হিংসার ভাব একেবারে চলে গেছে। রাখালেরা তাকে যে মেরেছিল, তা সে একেবারেই ভুলে গেছে।

সাপ বললে, হিংসা করতে আপনি বারণ করেছেন। গাছ থেকে পড়ে গেছে, এরকম পাতা, শুকনো ঘাস এসব খাই। তাইতে বোধ হয় একটু রোগা হয়ে গেছি।

গুরু—না, এতে অত রোগা হওয়া যায় না। তুই মনে করে দেখ, অন্য কারণ আছে।

গুরুর কথায় সাপ ভাবতে লাগল। অনেক ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, রাখালেরা একদিন তাকে খুব মেরেছিল। সে বললে, আজ্ঞে আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কাউকে আর হিংসা করি না দেখে একদিন রাখাল বালকেরা লাঠি দিয়ে আমাকে খুব মেরেছিল। অবোধ বালক, তারা কি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারে?

গুরু সবই বুঝতে পারলেন। সাপকে এক ধমক দিয়ে তিনি বললেন, তুই তো ভারি বোকা! হিংসা করতে তোকে বারণ করেছিলুম, ফোঁস করতে তো বারণ করি নি। তোকে কেউ মারতে আসলে আজ থেকে ফোঁস করিস।

এই বলে সাধু চলে গেলেন।

তারপর থেকে সাপটা দিনের বেলাই আহারের জন্য মাঠে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। রাখালেরা তাকে দেখতে পেয়ে

চীৎকার করে উঠল, আরে মরে নি রে, মরে নি। আবার সাপটা বেরিয়েছে রে, চল চল।

এই বলে রাখালেরা লাঠি হাতে তাকে মারতে গেল। যেমন তারা কাছে গিয়েছে, অমনি সাপটা আগের মত ফোঁস করে ফণা ধরে তেড়ে এল। আর যায় কোথায়? বীরের দল ভয়ে মা গো, বাবা গো বলে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল। সেদিন থেকে সাঁপের কাছে আর কেউ যেত না। সাপটাও নির্ভয়ে মাঠে বেড়িয়ে বেড়াত।

আশ্চর্য সংযোগ

একজনের ছিল একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটির কি অসুখ হয়ে একেবারে যায় যায়। তার বাবা যাকে পায়, ব্যাকুল হয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করে, কি করে ছেলেটি বাঁচবে? সকলেই বলে, এ রোগের ঔষধ নেই। শেষকালে একজন বললে, ঔষধ থাকবে না কেন? আছে। তবে বড় দুর্লভ। সে ঔষধ পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার।

লোকটি একেবারে কেঁদে ফেললে। হাত যোড় করে বললে, দাও বাবা, ঔষধের উপায় বলে। ছেলেটি আমার যায় যায়।

ঔষধজানা লোকটি বলল, স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটা ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপ তাড়া করবে। ব্যাঙকে সাপ কামড়াতে

গেলে ব্যাঙটি যাবে পালিয়ে, আর সাপের বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে। সেই বিষজল এনে একটু যদি রোগীকে খাওয়াতে পার, তবে ছেলে তোমার বাঁচবেই।

ভগবানের নাম করতে করতে লোকটি বাড়ি ফিরে এল। তারপর পাঁজি দেখে যখন আকাশে স্বাতি নক্ষত্রের উদয় হবে সেই সময় ঔষধের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ব্যাকুল হয়ে সে ভগবানকে ডাকছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তখন তার মনে আনন্দ হল, তবে বুঝি ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন। তারপর খুঁজতে খুঁজতে দেখলে শ্মশানের ধারে একটা মড়ার মাথার খুলিও পড়ে আছে, আর তাতে খানিকটা স্বাতি নক্ষত্রের জলও পড়েছে। তার মনে আরও আনন্দ হল। আরও ব্যাকুল হয়ে সে ভগবানকে ডাকতে লাগল।

তারপর দূরে একটা ব্যাঙও দেখা গেল। লোকটি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, আর একমনে ভগবানকে ডাকছে। ব্যাঙটা সত্যই খুলির জল খেতে গেল। ও মা, ঠিক সেই সময়ই কোত্থেকে একটা কালো সাপ ফোঁস করে ফণা ধরে ব্যাঙকে তাড়া করে এল। মানুষটার বুক তখন কাঁপছে।

সাপটি ব্যাঙকে কামড়াতে গেল, ব্যাঙও এক লাফে খুলির উপর দিয়ে পালিয়ে গেল। সাপের বিষ একেবারে খুলির মধ্যেই পড়ে গেল। লোকটির আনন্দ আর ধরে না। তখন সে চীৎকার করে ভগবানকে ডাকছে আর নাচছে। তার কাণ্ড

দেখে সাপটাও গেল পালিয়ে। খুব ভক্তিভাবে ভগবানকে ডাকলে তাঁর কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়।

এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আত্মীয় বন্ধুরা ছেলের শিয়রে বসে হরিনাম করছে। ঠিক সে সময় তার বাবা ঔষধ নিয়ে এল, একেবারে পাগলের মত। অনেক কষ্টে খানিকটা ঔষধ রোগীর মুখের ভিতর ঢেলে দেওয়া হল। একটু সময় যেতে না যেতেই রোগী মা বলে চোখ চাইলে।

ঘণ্টাকর্ণ

নিজের ভাবই সত্য আর সকলের ভাব মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়। একে বলে গোঁড়ামো। নিজের ভাবকে ভালবাসা ভাল, কিন্তু পরের মতকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এক ঈশ্বরই শিব বিষ্ণু কালী রাম আবার আল্লা গড সব হয়েছেন।

একজন লোক বহুদিন শিবের আরাধনা করেছিল। তার ভক্তির জোরে একদিন শিব এসে তাকে দেখা দিলেন। এ লোকটি ছিল বড় গোঁড়া। সে শিবকে পূজো করতো বটে, কিন্তু বিষ্ণুকে তার মোটেই ভাল লাগত না। শিব তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে বললেন, দেখ বাপু, গোঁড়ামো ভাল নয়। গোঁড়ামো ত্যাগ কর। যে শিব, সেই বিষ্ণু।

এই বলে শিব চলে গেলেন।

যে শিব সেই বিষ্ণু একথা শিব বলে গেলেন বটে, তবুও লোকটির মন থেকে বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ গেল না। তার কিছুদিন পরে শিব এসে আবার তাকে দেখা দিলেন। এবার শিবের হরিহররূপ। শরীরের আধখানা শিবমূর্তি, আধখানা বিষ্ণুমূর্তি।

শিবের এ মূর্তি দেখে লোকটি ভারি বিপদে পড়ল। শিব তার দেবতা, শিবকে পূজো না করলেও নয়। কিন্তু আধখানা যে বিষ্ণুমূর্তি। শেষকালে অনেক ভেবে চিন্তে শিবের পা-খানা ধুইয়ে দিয়ে পূজো করতে আরম্ভ করলে। বিষ্ণুর দিকে ফিরেও চাইলে না। খানিকক্ষণ পরে তার মনে হল, ধুনোর গন্ধ বিষ্ণুর নাকের ভিতর যাচ্ছে। অমনি সে খানিকটা তুলো বিষ্ণুমূর্তির নাকে গুঁজে দিলে।

শিব বললেন, দেখ বাপু, গোঁড়ামো ছাড়, আমার কথা শোন। দেখতে পাচ্ছ না, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু? বিষ্ণুকে ঘৃণা করলে শিবকেই ঘৃণা করা হয়। শিবকে তোমার ভাল লাগে পূজো কর। আপত্তি নেই। কিন্তু বিষ্ণুকে বিদ্বেষ করা উচিত নয়। একজনেরই দুটি রূপ—শিব ও বিষ্ণু।

শিব তাকে কত করে বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই সে তার গোঁ ছাড়লে না।

লোকটির মনের অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে শিব চলে গেলেন। সে কিছুতেই তার গোঁড়ামো ছাড়বে না। বরং গোঁড়ামো

তার দিন দিনই বেড়ে চলল। একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। শুনতে পেলে একজন পথিক বলছে, হরিবোল হরিবোল। আর যায় কোথায়? লোকটি অমনি লাঠি নিয়ে পথিককে তাড়া করলে।

ক্রমে ক্রমে সকলেই বুঝতে পারলে, হরিনাম শুনলে লোকটি ক্ষেপে উঠে। তারপর সে যেখানেই যেত, সেখানেই তাকে ছেলে বুড়ো সকলে হরি হরি বলে ক্ষেপাতে লাগল। শেষকালে আর উপায় না দেখে সে করলে কি? দুটি ঘণ্টা তার দু কানে বাঁধলে। যখনই লোক হরিনাম করত, অমনি সে তার মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাত। ঘণ্টার শব্দে তার কানে আর হরিনাম যেত না। তারপর থেকে লোকে তাকে ঘণ্টাকর্ণ বলে ডাকত।

গোঁড়াদের অবস্থা এইরূপই হয়।

বহুরূপী

মানুষ মনে করে, আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক। অন্যের কথা ভুল। আমার বুদ্ধির মত বুদ্ধি আর কারু নেই। আমি যা করছি তাই ঠিক, আর সকলে যা করছে তা ভুল। ধর্মের বেলাও মনে করে, আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল।

একজন জঙ্গলে গিয়েছিল। আসবার সময় গাছে সে একটা লাল জানোয়ার দেখে এল। সে এসে তার বন্ধুদের কাছে একথা গল্প করলে। বন্ধুদের একজন বললে, হাঁ, জানোয়ারটা আমিও দেখেছি বটে। তা তার গায়ের রঙ তো লাল নয়, হলদে।

আর একজন বললে, হুঁ, হলদে? হলদে কাকে বলে কখন দেখেছ? আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সবুজ।

আর একজন গম্ভীরভাবে বললে, তোমরা যা বলছ, কারু কথা ঠিক নয়। আমিও সে জানোয়ারটাকে দেখেছি, সেটি হল ঠিক বাদামী রঙের। লালও নয়, সবুজও নয়, হলদেও নয়।

তারপর সকলে মিলে মহা ঝগড়া। হৈ চৈ শুনে সেখানে অনেক লোক জড় হয়ে গেল। যারা এল, তারাও সব কথা শুনে কেউ লালের পক্ষে, কেউ সবুজের পক্ষে, এরকম এক

এক রঙের পক্ষে গিয়ে দল বেঁধে ঝগড়া করতে আরম্ভ করলে। শেষকালে হাতাহাতি মারামারির যোগাড়।

সেই জঙ্গলে একজন সাধু থাকতেন। তিনি তখন সেই পথে যাচ্ছিলেন। গোলমাল শুনে সেখানে এসে তিনি সব কথা শুনলেন। তাঁকে দেখে সকলে থামল। তখন তিনি বললেন, দেখ, আমি ঐ জঙ্গলেই থাকি। এ জানোয়ারটাকে আমি রাতদিন দেখি। তার নাম গিরগিটি। সে বহুরূপী। কখন যে তার কি রঙ হয়, তার কিছু ঠিক নেই। তোমরা যে যা বলছ সবই ঠিক। ও কখন হয় লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন বাদামী, কখন আসমানি, আরও কত রঙ! আবার কখন কখন দেখি, কোন রঙই নেই।

সাধুর কথায় ঝগড়া বিবাদ শেষ হল।